গ্রামবাংলার খবর

উৎসব সংখ্যা ১৪৩৩

১৬ অক্টোবর ২০২৬ ❑ ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩

সম্পাদকীয় ❑ ১

বিশেষ নিবন্ধ

অশোক চট্টোপাধ্যায় ❑ ৩, অপূর্ব সাহা ❑ ১০, সুকুমার মিত্র ❑ ১২, জগদীশ মণ্ডল ❑ ৩১

গল্প

অর্চনা দে বিশ্বাস ❑ ১৬, সুনির্মল বসু ❑ ২৯, সুনির্মল বসু ❑ ৩৩, গৌরাঙ্গ দাস ❑ ৩৭, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ❑ ৩৯, বিবর দত্ত ❑ ৪১, ড. অরুণ অধিকারী ❑ ৪৭, কবিরুল (রঞ্জিত মল্লিক) ❑ ৫০, অরিজিৎ ঘোষ ❑ ৫৪, শ্যামল চ্যাটার্জী ❑ ৫৬, কৃষ্ণেন্দু রায় (শানু) ❑ ৫৮, দিলীপ রায় ❑ ৬৬

কবিতা

তারাশঙ্কর আচার্য্য ❑ ১৯, সৌভিক দাস ❑ ১৯, বিপ্লব বড়াল ❑ ১৯, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ২০, সুদিন গোলদার ❑ ২০, অরুণ কুমার মান্না ❑ ২১, সুশান্ত সেন ❑ ২১, অষ্টপদ মালিক ❑ ২১, চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ❑ ২২, সঞ্জীবন রায় ❑ ২২, অভিজিৎ দাশ ❑ ২৩ টুম্পা মুখার্জী ❑ ২৩

রাজনীতি

নোটন কর ❑ ২৪, সৈকত মিস্ত্রী ❑ ২৭, কার্ত্তিক ইন্দু ❑ ৪৬

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

সুবীর সাহা ❑ ৩৩, সফিয়ার রহমান ❑ ৩৫, দেবদাস চট্টোপাধ্যায় ❑ ৪৩, হিমাংশু দাস ❑ ৪৫, প্রদীপ ব্যানার্জি ❑ ৬০, উৎপল ব্যানার্জী ❑ ৬২, পাঁচুগোপাল হাজরা ❑ ৬৩

বিশেষ প্রতিবেদন

বিক্রম পাল ❑ ৬১, অমর চক্রবর্তী ❑ ৬৫

রম্য রচনা

আশিস কুমার ঘোষ ❑ ৭১

প্রচ্ছদ

পার্থ মিত্র

প্রচ্ছদ বিন্যাস

বিধান ভৌমিক

অক্ষর বিন্যাস

মিতা ভৌমিক

সম্পাদক

দিলীপ রায়

সহযোগী

লাল মহম্মদ, অরিজিৎ ঘোষ, সৈকত মিস্ত্রী, মিনা রায়, সালমা বেগম, সিতাংশু ঘোষ, সন্দীপ পাঠক, অমর চক্রবর্তী, পার্থ মিত্র ও সৌমেন নিয়োগী

রেজি নং-**ডাবলু বি বি ই এন/১৯৯৯/০১২৫৬**

প্রকাশক, স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক: দিলীপ রায় কর্তৃক ৪৯১/৪, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২২২ থেকে প্রকাশিত ও আয়েষা প্রিন্টার্স, মালিয়াকুড়, বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : **১৫০ টাকা**

সম্পাদকীয়

ভিন্নমতের পরিসরই গণতন্ত্রের ভিত

ভিন্নমতের পরিসর থাকা গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত। প্রতিনিয়ত এই শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে। কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানা পদ্ধতিতে ভিন্নমতকে দমন করছে। সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা বা সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ধর্মকে হাতিয়ার করে ভারতের বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে এই সরকার। এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসে নয়া সরকার সেই একই পথ অনুসরণ করেছে। এই সরকারের মদতে বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদ উৎসব বা দুর্গাপুজো নিয়েও বাঙালির চিরাচরিত ভাবনার বিরুদ্ধে নানারকম ফতোয়া জারি করেছে স্বঘোষিত এক ধর্মগুরু। যা নিয়ে প্রবল বিতর্কের পর বিষয়টি চাপা পড়ে গিয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী পুজোর বুকস্টলে শারদ উৎসব লেখা যাবে না, দুর্গাপুজো লিখতে হবে নিদান দিয়েছেন। পুজোর দিনগুলোতে মার্ক্সবাদী সাহিত্যের স্টল করার অনুমতির জন্য এখন আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। কোটি কোটি নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শুরু হয়েছে তীব্র আন্দোলন। অভিযোগ, গণতন্ত্র রক্ষার এই আন্দোলন রুখতে রাজধানী দিল্লিতে পুলিশের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে সরকার। সেই সঙ্গে গণপরিবহন ও ইন্টারনেট পরিষেবাকে বাতিল করে অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করেছে। এভাবে নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতাকে আড়াল করছে সরকার। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ থাকার পরও সাংবাদিকদের কাজে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। প্রতিবাদের খবর সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের হেনস্তা করা হচ্ছে। আটক করা হচ্ছে। এ রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর শাসকদলের কর্মীরা বারবার আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। সেই ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। আর সবক্ষেত্রেই পুলিশকে নীরব দর্শক হতে দেখা গিয়েছে। অভিযুক্তের ওপর হামলা, অভিযুক্তকে মাজায় দড়ি দিয়ে রাস্তায় হাঁটানো, এনকাউন্টার-এর মতো বেআইনি ও অমানবিক ঘটনার একাধিক চিত্র দেখা গিয়েছে। গত পাঁচমাসে এ রাজ্যে সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের ওপর প্রায় ৬০টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিবাদও শুরু হয়েছে।

দেশজুড়ে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির আবহে বাংলায় শারদ উৎসব উদযাপন শুরু হয়েছে। এই উৎসবের মধ্যেও নিশ্চয় কোথাও কোথাও প্রতিবাদের সুর থাকবে। আশা করা যায়, গণতন্ত্রে ভিন্নমতের পরিসর রক্ষার দাবি, ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে দেশজুড়ে যে আন্দোলন তার ছোঁয়াও থাকবে শারদ উৎসবে। আর বিগত দিনের মতো এবারও শান্তিপূর্ণ ভাবে বাংলায় উদযাপিত হবে শারদ উৎসব।

দিলীপ রায়

১৪ অক্টোবর, ২০২৬

শারদ শুভেচ্ছায়...

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

UTPAL BANERJEE
9434115941 / 7699500181







বঙ্কিমচন্দ্র ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' : ফিরে দেখা

অশোক চট্টোপাধ্যায়

১৭৫৭-য় পলাশি ষড়যন্ত্রের পর থেকে পরবর্তী একশ বছরে বিদেশি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল। এদেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠনে ইংরেজদের অবারিত সাফল্য তাদের আরো বেশি বেশি করে মুনাফালোভী করে তোলে। মুনাফা এবং অর্থলিপ্সার সঙ্গে এদেশের ভূমিব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টা যথাযথ উপলব্ধিতে এনে তারা নতুন ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে মনোনিবেশ করে। এরই সূত্রে ১৭৯৩-এ প্রবর্তিত হয় কর্নওয়ালিশীয় নতুন ভূমিব্যবস্থা যার পরিচিত নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের মাধ্যমে তারা একদিকে যেমন পুরানো ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিসম্পর্কের ধ্বংসসাধন করে, তেমনি অন্যদিকে গড়ে তোলে নব্য জমিদার ও একটি সহযোগী মধ্যশ্রেণী যারা এই বন্দোবস্তের জনকদের নিকট আনুগত্য পোষণ করবে।

পলাশি-উত্তর পর্যায়ে এদেশের কৃষক জনসাধারণের ওপর যে অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু হয়, তা এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। নিপীড়িত অত্যাচারিত কৃষকরা এই বিদেশি শাসক এবং তার দেশীয় তল্পিবাহক জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে সামিল হতে থাকে। নিজেদের জীবনমরণের এই সমস্যা সমাধানে এই ধারাবাহিক সশস্ত্র বিদ্রোহকে তারা তাদের শ্রেণীযুদ্ধ বলেই মনে করতো। আর স্বাভাবিকভাবেই এই কৃষকবিদ্রোহ নিচের দিক দিয়ে দেখতে গেলে স্থানীয় জমিদারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও তা শেষপর্যন্ত আঘাত হানতো এই জমিদারদের জনক বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসকদের শ্রেণীস্বার্থে। ফলে দুটো শ্রেণী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ হিসেবে। একদিকে জমিদার ও তার সহযোগী মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত প্রতিনিধি এবং স্বয়ং বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্মিলিত শ্রেণী ঐক্যের যুক্তফ্রন্ট এবং অন্যদিকে নিপীড়িত নির্যাতিত মুমুক্ষু কৃষক জনসাধারণ। কৃষক জনসাধারণের এই সশস্ত্র বিদ্রোহের ন্যায্যতাকে এই অত্যাচারী জমিদার, তাদের শ্রেণীমিত্র শহুরে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং স্বয়ং বিদেশি শাসকশ্রেণী স্বীকৃতি দিতে একান্তই পরাঙ্মুখ ছিল। বরং বিদ্রোহ দমন যখন স্থানীয় জমিদারদের দ্বারা অসম্ভব হয়ে উঠতো, তখন স্বয়ং বিদেশি শাসকরা তাদের শ্রেণীমিত্র জমিদারদের ত্রাতার ভূমিকায় সরাসরি অবতীর্ণ হতো এবং বন্দুক ও কামানের গোলার মুখে বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস পেতো। আর তাদের এ ধরনের নির্মম দমনকার্যের সমর্থনে যুক্তি আহরণ ও তার প্রচারকার্যে সক্রিয় ভূমিকা নিতেন শহুরে মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধিরা। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থেকেছে।

নীল আন্দোলনের সময় থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যেহেতু এই আন্দোলনটি সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ নয়, যেহেতু এই বিদ্রোহ প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থাৎ বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদকামী নয়, বরং অত্যাচারী নীলকরদের দমন করে সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রত্যাশী;সেইহেতু বাঙলার মধ্যশ্রেণীর অগ্রগণ্য প্রতিনিধি এমনকি নব্যজমিদারদের অনেকেই এই আন্দোলনে শারীরিকভাবে সামিল হন এবং এতদিনকার সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহের ধারাবাহিকতার বিপ্রতীপে একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে এই নীল আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াসে ব্রতী হন এবং এই কাজে এঁরা সফলও হন। কৃষক বিদ্রোহের পুরানো ধারার বদলে শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন ধারা। আন্দোলনকারীদের কিছু পাইয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট করার রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে। অত্যাচারী জমিদার, নীলকর, চা-কর প্রমুখদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তিদানের মাধ্যমে, এই নবপ্রবর্তিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের অপরিহার্যতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নাতীত প্রতিষ্ঠা দেওয়া হলো, তেমনি অন্যদিকে আন্দোলনকারীদেরও বেশি বেশি করে সরকারের কৃপাপ্রার্থী করে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির অঙ্গীভূত করাও সম্ভব হলো। আর এই কাজে শহুরে মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা বাস্তবিক ঐতিহাসিক অভিধায় চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। কেননা এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৮৮৫-তে গড়ে ওঠে জাতীয় কংগ্রেস। স্বদেশের এবং স্ব-কালের বিদেশি শাসক ও জমিদারশ্রেণীর শ্রেণীগত মিত্র এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে নির্মিতি পেয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষকদর্শন ও তার বৈভব।

২

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সময় থেকে বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি তথা বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মানবিক দর্শনের আধারে কৃষকদের দুর্দশার কথামালার সঙ্গে পরিচিত হতে ও তা লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। প্যারিচাঁদ মিত্র সম্ভবত এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভ্যু'-তে তিনি লেখেন 'দ্য জমিনদার অ্যান্ড দ্য রায়ত'। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' লিপিবদ্ধ করেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন লেখায় ('হিন্দু পেট্রিঅট'-এ) কৃষকদের সমস্যার কথা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নবীনকৃষ্ণ বসুও বেথুন সোসাইটির সেক্রেটারি হিসেবে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে জমিদারদের কৃষক নিপীড়নের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সময়টা ছিল ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ) তাঁর 'বেঙ্গল রায়তস : দেয়ার রাইটস অ্যান্ড লায়াবিলিটিজ' শীর্ষক রচনায় কৃষকদের সমস্যার কথা আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া সমসময়ের 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন', 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী', 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রভৃতি অসংখ্য পত্রপত্রিকায় কৃষক সমস্যার কথা লিখিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার চারটি সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করেন ১২৭৯ বঙ্গাব্দে (১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে)। 'বঙ্গদর্শন'-এর যে চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিক 'বঙ্গদেশের কৃষক' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি হলো : ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ১২৭৯ এবং ফাল্গুন।

উপরিউক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক প্রবন্ধটি পরপর চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি। মাসিক বঙ্গদর্শনের একটা অন্তর একটা সংখ্যায় প্রবন্ধটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল (অর্থাৎ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার পর আশ্বিনে নয়, কার্তিক সংখ্যায়, কার্তিকের পর অগ্রহায়ণে নয়, পৌষ সংখ্যায়। অনুরূপভাবে শেষ কিস্তি তথা চতুর্থ পরিচ্ছদ প্রকাশিত হয় মাঘ-এর নয়, পৌষ মাসের সংখ্যায়) অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখাটির বিষয়ে খুবই যত্নশীল ছিলেন এবং লেখাটি একটানা লিখে প্রকাশার্থ দেননি। তিনি নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক, সময় নিয়ে, একটা অন্তর একটা সংখ্যায় চার পর্বের লেখাটি প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে এই 'বঙ্গদেশের কৃষক' তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয়ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে (অর্থাৎ গ্রন্থবদ্ধ হয়ে) প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ২৫ তারিখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধপ্রবন্ধ প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই। তাও এটি আবার তাঁর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বিবিধ সমালোচন' এবং ১৮৭৯-তে প্রকাশিত 'প্রবন্ধ পুস্তক'-এর দুই মলাটে গ্রথিত একীভূত গ্রন্থ। 'বিবিধ সমালোচন' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তক' যেহেতু 'অপ্রাপ্য' এবং দু'খানি পৃথক গ্রন্থ নিষ্প্রয়োজন সেইহেতু এই দুটি গ্রন্থ 'বিবিধপ্রবন্ধ' প্রথম ভাগ শীর্ষক একটি গ্রন্থরূপে তিনি প্রকাশ করেন ১৮৮৭-তে। এই গ্রন্থে 'বঙ্গ দেশের কৃষক'-এর অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কোনও চিন্তাভাবনাই বঙ্কিমের ছিল না। তিনি এই 'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থবদ্ধ করেন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'বিবিধপ্রবন্ধ' দ্বিতীয়ভাগ-এর অন্তর্ভুক্তিতেই। অর্থাৎ 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশের প্রায় কুড়ি বছরের মাথায় এসে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। এহেন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ গ্রন্থবদ্ধ করে প্রকাশের ব্যাপারে বঙ্কিমের কি কোনও দ্বিধা ছিল?

মনে রাখা দরকার যে বঙ্গদর্শনের ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এবং ১৮৯২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ এবং ১২৭০ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর কিছু অংশ নিয়ে 'সাম্য' নামে একটি গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের খণ্ড-অংশ তিনি 'সাম্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশের দীর্ঘ তেরো বছর আগে।

'সাম্য'-এর 'বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র অযাচিতভাবে একটি কথা উল্লেখ করেছিলেন এই গ্রন্থে 'কৃষকের কথা যে আধুনিক সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে। প্রাচীন বর্ণবৈষম্যের ফলস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন'। এই অযাচিত কৈফিয়ৎ বঙ্কিম কেন দিয়েছিলেন আগেভাগে? তবে কি এই গ্রন্থ নিয়ে তাঁর কোনও আশঙ্কার জায়গা থেকে গিয়েছিল? আর সেই আশঙ্কার জায়গা থেকেই কি তিনি আগেভাগে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে এই কথাগুলি লিখেছিলেন?

'সাম্য' অবশ্য যথেষ্ট জনাদর লাভ করেছিল। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র এই জনাদরকে সম্মান জানিয়ে এর নতুন সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হননি। বরং 'সাম্যটা সব ভুল' বলে অভিহিত করে এর নতুন মুদ্রণ বা সংস্করণ প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছিলেন। 'সাম্যটা সব ভুল';একথা বঙ্কিম কেন বলেছিলেন তা অব্যাখ্যাত। 'সাম্য' যদি 'সব ভুল' হয় তবে সেই 'ভুল' কি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর মুদ্রিত অংশের উপরও বর্তায় না? যদি তাই হয় তবে পরবর্তী তেরো বছরের মাথায় তিনি কেন 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর পূর্ণাঙ্গ পাঠ বিবিধপ্রবন্ধে দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করেছিলেন। এরও কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি।

৩

'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর পূর্ণাঙ্গ পাঠের শিরোভাগে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি কথা নোট হিসেবে সংযোজিত করেছিলেন। এখানেও একটা অযাচিত কৈফিয়ৎ তিনি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ দেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই, অনেকস্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্ব্বল।

এই বক্তব্য তো গ্রন্থের মূল বক্তব্যকেই নস্যাৎ করে। তবে এই প্রবন্ধটি নতুন করে ছেপে প্রকাশ করার কী প্রয়োজন ছিল? বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন : এই সকল কারণে আমি এতদিন এ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এক্ষণে যে আমি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। কারণ 'অনেকগুলো' বললেও বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচটি (৫) নির্দিষ্ট কারণের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেগুলো হলো (১) এই প্রবন্ধপাঠে পঁচিশ বছর আগে দেশের অবস্থা জানা যায় (২) এরপর থেকে কৃষকদের অবস্থা নিয়ে সামাজিক আন্দোলন হতে থাকে; ইতিমধ্যে কৃষকদের যে 'উন্নতি সাধিত' হয়েছে এই প্রবন্ধই তার কারণ (৩) এই প্রবন্ধে কৃষকদের যে দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে তা এখনও 'অনেক প্রদেশে' অপরিবর্তিত আছে এবং যে সব উৎপাতের কথা বলা হয়েছে তার সবগুলো এখনও অন্তর্হিত হয়নি (৪) এই প্রবন্ধ তাঁকে (অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে) কিছু 'যশোলাভে' সমর্থ করেছিল এবং (৫) 'বঙ্গদেশের কৃষক' একসময় পুনর্মুদ্রিত করবেন না বলে 'সাম্য'-এ তিনি এর খণ্ডাংশ মুদ্রিত করেছিলেন, এখন 'সাম্য' গ্রন্থটি 'বিলুপ্ত' করায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে!

অবস্থা পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। ১৮৯২-এর মে মাসে 'বিবিধপ্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগ-এ পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটি স্থান দিয়ে তার শিরোভাগে বঙ্কিম একথা লিখছেন, যার অর্থ কৃষকদের যে অবস্থার কথা তিনি লিখছেন তার সময়কাল ১৮৯২-২৫গু১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং ১৮৬৭-র সময়কালের কৃষকদের দুর্দশার কথা তিনি লিখে বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করছেন ১৮৭২/৭৩ খ্রিস্টাব্দে আর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থবদ্ধ করে প্রকাশ ঘটাচ্ছেন আরও প্রায় কুড়ি বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন যে তাঁর এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে সংঘটিত সামাজিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে কৃষকদের কিছু 'উন্নতি সাধিত' হয়েছে;অর্থাৎ এই বৈপ্লবিক ঘটনার 'কারণ' হিসেবে কাজ করেছে তাঁর এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমের এই আত্মশ্লাঘা আরও কয়েকটি প্রশ্নকে অনাবৃত করে। যেমন এখানে কৃষকদের সামাজিক আন্দোলন বলতে কিন্তু তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ১৮৭২/৭৩-এর পাবনা-সিরাজগঞ্জের কৃষকবিদ্রোহের কথা এবং কৃষকদের 'উন্নতি সাধিত' হওয়া, জমিদারের অত্যাচারের ক্রমহ্রাসমানতা ইত্যাকার কথার মাধ্যমে ১৮৮৫-র প্রজাস্বত্ত্ব আইনের কথা বলতে

চেয়েছেন;এবং বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটিই এই বৈপ্লবিক ঘটনাসমূহের 'কারণ'। বঙ্কিমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাঁর প্রবন্ধের ভিত্তিভূমি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭২/৭৩-এ তিনি সেইসব ঘটনার কথা লিখছেন যখন পাবনা বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। এই পাবনা-সিরাজগঞ্জ কৃষক বিদ্রোহের পরিণতিতেই ১৮৮৫-র প্রজাস্বত্ব আইন বলবৎ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধই যদি এইসব বৈপ্লবিক ঘটনাবলির কারণ হয়, তবে তিনি এই প্রবন্ধ গ্রন্থবদ্ধ করে প্রকাশ করতে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সময় নিলেন কেন? এ প্রশ্ন সঙ্গত। তৃতীয়ত, এই প্রবন্ধে কৃষকদের যে সব দুরবস্থার কথা এবং তাদের জীবনে যেসব উৎপাতের কথা বলা হয়েছিল তার সবগুলিই 'অন্তর্হিত' হয়নি। অর্থাৎ কিছু কিছু সমস্যার সুরাহা হয়েছে। চতুর্থত, এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রকে বেশ কিছুটা যশের অধিকারী করেছিল; সুতরাং সেই যশাকাঙ্ক্ষাও তাঁকে এই প্রবন্ধটি গ্রন্থবদ্ধ করে প্রকাশ করতে উদ্যোগী করেছে। এখানেও প্রশ্ন আসে। 'সাম্য'-ও তো তাঁকে যশের অধিকারী করেছিল, তিনি যদি যশাকাঙক্ষী না হয়ে 'সাম্য' পুনঃপ্রকাশ থেকে বিরত থেকে সঠিক কাজ করে থাকেন, তবে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটল কেন? পঞ্চমত, একসময় বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে 'বঙ্গদেশের কৃষক' আর 'পুনর্মুদ্রণ' করবেন না। এই সিদ্ধান্তের হেতু ব্যাখ্যাত নয়। পরে 'সাম্য' আর প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া আবার 'বঙ্গদেশের কৃষক' পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির মধ্যে বিরোধাভাষ লক্ষনীয়।

আসলে এসবের নির্গলিতার্থ হিসেবে যা বেরিয়ে আসে তা হলো : 'সাম্য'-এর প্রবন্ধ এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর প্রবন্ধসমূহ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত দোটানায় ছিলেন। একদিকে নিজে ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ আমলা, এদেশে ব্রিটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক, অন্যদিকে দেশীয় কৃষকসাধারণের দুঃখদুর্দশার ব্যাপারে যথেষ্ট সংবেদনশীল। জমিদারদের কৃষকপীড়ন একদিকে যেমন তাঁকে ব্যথিত করেছে, অন্যদিকে শ্রেণী হিসেবে জমিদার শ্রেণীর মিত্র হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধাচরণও করতে পারেন নি। তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এ তিনি কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা, জমিদারের শোষণ, আইন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা লিখছেন খুব ভাবনা চিন্তা করে, সর্তকতার সঙ্গেই। ফলে লেখাগুলি সমসময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়। অর্থাৎ এইসব লেখার জন্য তিনি যশের অধিকারী হন। ফলে যশাকাঙ্ক্ষার জায়গা থেকে একদিকে তিনি যেমন চেয়েছেন লেখাগুলোকে আরও বৃহত্তর পাঠকের দরবারে পেশ করতে, অন্যদিকে এর পরিণতি নিয়ে আশঙ্কাগ্রস্তও হয়েছেন। এরকমই এক দ্বিধাচিত্ততার অবস্থান থেকে তিনি 'সাম্য'-কে সম্পূর্ণ ভুল আখ্যা দিয়ে তার পুনঃপ্রকাশ রহিত করেন, আবার উত্তরকালে এই 'যশ'-এর কথা উল্লেখ করে 'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থবদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন আরও কিছু সকারণ ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে।

৪

'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্বিধায় লিখছেন :

ক) বাঙ্গালি কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী।

খ) জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।

গ) কৃষক পেটে খাইলে জমিদার টাকার রাশির উপর রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র সরাসরি লিখছেন যে তাঁর এই প্রবন্ধের কারণে হয়তো তিনি 'সমাজশ্রেষ্ঠ ভূস্বামী মন্ডলীর' বিরাগভাজন হবেন;তবে তাতে তিনি ভীত নন, সত্য কথা বলতে পরাম্মুখ নন; তাঁর 'বঙ্গদর্শন' সত্যকথা বলতে যদি পরাম্মুখ হয়, তবে বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রেয়।

অথচ এই বঙ্কিমচন্দ্রই আবার লিখছেন :

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন মনে করি। যে সুহৃদগণের প্রীতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমিদার।

এখানে একটা নির্দিষ্ট বার্তা (message) প্রচার করতে চেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি 'জমিদার'-এর অর্থাৎ শ্রেণী হিসেবে জমিদারের 'দ্বেষক' নন, কেননা 'কোন জমীদার' অর্থাৎ শ্রেণী হিসেবে কোন জমিদারই তাঁর 'অনিষ্ট' করেন নি। বরং অনেক জমিদারকে তিনি প্রশংসা করেন, তাঁর বহু পরম বন্ধুজনও জমিদার। অর্থাৎ শ্রেণী হিসেবে তিনি জমিদারের বিরুদ্ধে নন। তিনি জমিদারতন্ত্রের পরিপোষক। জমিদারদের মধ্যে (অবশ্যই ব্যক্তি হিসেবে, শ্রেণী হিসেবে নয়) তিনি ভালো জমিদার ও খারাপ জমিদার;এই বিভাজনের পক্ষপাতী।

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সচেতনভাবে লিখেছেন যে তিনি 'জমীদার সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বলছেন না। এই 'জমীদার সম্প্রদায়' শব্দযুগল শ্রেণী হিসেবে জমিদার-এই বর্গের দ্যোতক। তাই তিনি ক্ষুদ্ধচিত্তে বলেছেন : যাঁরা জমিদার নির্বিশেষে তাঁদের 'দুরাত্মা বা অত্যাচারী' বলেন, তাঁরা 'নিতান্ত মিথ্যাবাদী'। এখানে এই 'মিথ্যাবাদী' শব্দের প্রয়োগ তাঁর ক্রোধসঞ্জাত মনোভঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করে।

পরাণ মণ্ডল নামক এক কল্পিত চরিত্রকে সামনে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারি নিষ্পেষণ ও কৃষকের অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন। হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত নামীয় আরও দুটি কল্পিত চরিত্রকে তিনি তাঁর রচনায় হাজির করেছেন তাঁদের চিরন্তন দারিদ্র্যের চিত্র অঙ্কন করার লক্ষ্যে। বাংলার কৃষকদের জীবনাচরণ, তাদের নিদারুণ দারিদ্র্য, তাদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার, নিপীড়নের তথ্যাবলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র রীতিমতো পরিচিত ছিলেন। কৃষকদের দুরবস্থা তথা দুর্দশা তাঁকে স্পর্শ করতো। তাই তিনি আন্তরিকভাবেই বঙ্গদেশের কৃষকদের একটা নিটোল চিত্র আঁকতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি নিজের প্রদত্ত তথ্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অগাস্ট তারিখের 'ইন্ডিয়ান অবজারভার'-এর ১৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিবরণের কথাও উল্লেখ করেছেন। বন্যাক্লীষ্ট প্রজাদের সাহায্য করা দূরে থাকুক, জমিদারের লোকজন পাইক-পেয়াদা সহ 'বাজে আদায়'-এর লক্ষ্যে এইসব দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকপ্রজাদের ওপর জুলুম করতে থাকে। প্রজারা কোন উপায় না পেয়ে শেষপর্যন্ত 'ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল'। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসামীদের সাজাও দেন আবার 'আইন অনুসারে' তাদের 'খালাস'ও দেন। এর প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন : 'সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য

আসামী খালাস?' বঙ্কিমের এই ক্ষোভসঞ্জাত শ্লেষোক্তি আন্তরিক। এরপরই বঙ্কিমচন্দ্র আবার লেখেন :

সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচার পরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই; যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে;

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আবার তাঁর ভালো জমিদার খারাপ জমিদারের তত্ত্ব আমদানি করতে চেয়েছেন। কিছু কিছু খারাপ জমিদার আছে যারা অত্যাচারপরায়ণ। কিন্তু অনেক বেশিসংখ্যক ভালো জমিদার আছেন যাঁরা অত্যাচারী নয়। শুধু তাই নয়, এই খারাপ অর্থাৎ 'অত্যাচারপরায়ণ' জমিদারের সংখ্যা দ্রুত কমছে। অর্থাৎ বঙ্কিমী-তত্ত্বে ভালো জমিদারদের সংখ্যাই দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্কিমের শ্রেণীদর্শন তাঁকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে গেলেও, বাস্তব তথ্য ছিল এর পরিপন্থী।

বঙ্কিমচন্দ্র আরও দেখাতে চেয়েছেন যে কলকাতার সুশিক্ষিত ভূস্বামীরা অত্যাচারী নন, তাঁদের অজ্ঞাতে এবং নির্দেশ ব্যতিরেকে তাঁদের নায়েব-গোমস্তারা কিছু অত্যাচার করে থাকে। বঙ্কিম এখানে সম্ভবত কলকাতার ঠাকুর জমিদারদের কথা বলতে চেয়েছেন। যদি তাই হয়, তবে বলতেই হয় বঙ্কিমের এই বক্তব্য অযথার্থ। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার নির্ভীক সাংবাদিক হরিনাথ মজুমদারের সমসময়ের লেখাপত্তর এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। উনিশ শতকের জমিদারদের অত্যাচার, প্রজাশোষণ এবং কলকাতার ঠাকুর জমিদারদের প্রজাস্বার্থবিরুদ্ধ ভূমিকার বিষয়ে আগ্রহী পাঠকগণ বর্তমান লেখকের 'উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন কাঙাল হরিনাথ ও 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা', শীর্ষক গ্রন্থটি (উবুদশ। কলকাতা। ডিসেম্বর ২০২৫ সংস্করণ) দেখতে পারেন। এরপর বঙ্কিম আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রজাদের দোষ-ত্রুটির অন্বেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'অনেক জমীদারীর প্রজাও ভালো নহে। পীড়ন না করিলে খাজনা দেয় না'। এখানে বঙ্কিম ভালো জমিদারের পাশাপাশি খারাপ প্রজার কথা বিবৃত করেছেন। এইসব খারাপ প্রজারা পীড়ন না করলে খাজনা দেয় না। অর্থাৎ এখানে খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে পীড়ন বঙ্কিমী তত্ত্বে যুক্তিসিদ্ধ হয়। অবশ্য এর পরেই আবার বঙ্কিম বলেন : প্রজার ওপর আগে অত্যাচার না হলে প্রজারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না। এর পাশাপাশি তিনি আবার বলেন :

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারের দ্বারা অনেক সৎকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জন করিতেছে, ইহা জমিদারদিগের গুণে।...অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা অতি অন্যায়পরতার কাজ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শ্রেণীদর্শন, শ্রেণী-আনুগত্য বজায় রেখেই কৃষকদের দুঃখদুর্দশার প্রতি তাঁর মমত্ববোধের ব্যালান্স শিট তৈরি করতে চেয়েছেন। দুই বঙ্কিম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বঙ্কিমচন্দ্র শেষপর্যন্ত নবহিন্দুবাদের কোলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৫

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের যে দুর্দশার চিত্রাঙ্কন করেছেন তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ, তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই। সমস্যা হয়েছে তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান, শ্রেণীদর্শনজনিত আনুগত্যনামা। নীল আন্দোলনের (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ) সময় থেকে দেখা গেছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধিরা এই আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করে পূর্বেকার কৃষকবিদ্রোহের সরকারবিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহের ধারা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। নীল আন্দোলন সরকারবিরোধী ছিল না, ছিল অত্যাচারী নীলকরবিরোধী। এখানে বিদেশি ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে আইনমাফিক দরবার করা হয়েছিল যাতে অত্যাচারী নীলকরদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা হয়। সুচতুর ঔপনিবেশিক রাজশক্তিও এই আন্দোলনের দিগ্‌দর্শনকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনায় সদর্থক ভূমিকা নিয়ে নিজেদের জনমানসে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই আন্দোলনের নবপ্রবর্তিত ধারায় পরবর্তীতে চা-কর বিরোধী আন্দোলন সহ বেশকিছু আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল যার নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিলেন সমকালীন মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধিরা। বঙ্কিমচন্দ্র এসব তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি কৃষক জনসাধারণের দুর্দশা সম্পর্কে আন্তরিকভাবে ভাবিত ছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনিই একথাও সমধিক সত্য যে কৃষকদের তরফে যে কোন ধরনের বিদ্রোহের সম্ভাবনায় তিনি আশঙ্কিত ছিলেন। আর আশঙ্কার জায়গা থেকেই প্রথমে তিনি 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন :

সমাজ সংস্কারকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণ-এর উদ্দেশ্য এবংবিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন;আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর;যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করতে পারি না।

অবশ্য পরবর্তীতে নীলদর্পণের জনপ্রিয়তা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বক্তব্যের পরিবর্তন ঘটান। পরিবর্তিত বক্তব্যেও অবশ্য বঙ্কিম তাঁর অসন্তুষ্টিকে সম্পূর্ণ বির্সজন দিতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন : সমাজ সংস্কারকের উদ্দেশ্য নিয়ে কাব্য (অর্থাৎ নাটক) রচনা করলে যে 'কবিত্ব নিষ্ফল হয়' সেকথা বলতে ভোলেন নি। আবার পরের লাইনে একে 'উৎকৃষ্ট-ও বলেছেন। বঙ্কিমী মানসিকতার দ্বন্দ্ববিধুরতা এখানে পরিষ্কার। তিনি তো জানতেন যে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ-এর ভূমিকায় অত্যাচারী নীলকরদের কাছে সংশোধিত হওয়ার আবেদন রেখেছেন, মহারানি ভিক্টোরিআ ও ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ওপর কৃষক-অত্যাচার নিবারণের প্রশ্নে অমেয় আস্থা রেখেছেন। তুবও বঙ্কিম অস্বস্তিমুক্ত হতে পারেন নি।

যে সময়কালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখছেন তার সমসময়ে পাবনা-সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে। সেই

সময়ে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মির মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' নাটক প্রকাশিত হয়। এই দর্পণ নাটকটিও নীলদর্পণের পথ ও মতানুসারী। তবে নীলদর্পণে যে একজন তোরাপ-কে পাওয়া যায়, এখানে তা-ও অমিল। শুধুমাত্র জমিদারদের অত্যাচার এখানে চিত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এতেও ভয় পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি তিনি এবং তাঁর পত্রিকা 'প্রজার হিতৈষী' এবং 'প্রজার হিত কামনা' কখনও 'ত্যাগ' করবেন না। এতদসত্ত্বেও পাবনা প্রজাবিদ্রোহের সময় মির মশাররফের এই জমিদার দর্পণ, তাঁর মতে, 'জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি'-র সামিল। তিনি পাবনার বিদ্রোহী প্রজাদের 'আচরণ' শুনে 'বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত' হয়েছেন। আর এজন্য বঙ্কিমের পরামর্শ : 'এ সময়ে এ গ্রন্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক'। লক্ষণীয় সমসময়ের একটি উল্লেখযোগ্য নাটকের বইকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব রাখছেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। রাজভক্তির এর চাইতে ভালো নির্দশন তিনি আর কীভাবে রাখতে পারতেন। তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এই তিনি সভয়ে উচ্চারণ করেছেন :

তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন...? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ;দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।...সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?

স্বভাবতই এই কৃষিজীবীদের বিদ্রোহ-ভয় তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াতো। তাই যাতে এই কৃষকরা বিদ্রোহ করতে না পারে তার জন্য তাদের দুর্দশা-মোচনে তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। আর তাদের এই দুর্দশামোচনের জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন কাদের কাছে! প্রাথমিকভাবে রাজপুরুষদের কাছে নয়, জনসাধারণের কাছেও নয়। তবে কার কাছে? 'জমিদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ'। জমিদারের অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্ত করার আবেদন তিনি জানাচ্ছেন জমিদারের কাছেই! বঙ্কিমের শ্রেণীদর্শনের অনিবার্য পরিণতি এটাই। যাদের আসামীর কাঠগড়ায় তোলা উচিত, একজন বিচারক হয়েও, বঙ্কিমচন্দ্র তাদেরই বিচারকের আসনে বসাতে চেয়েছেন!

৬

জমিদারদের অতিক্ষমতাশালী হয়ে প্রজাশোষণ ও অত্যাচার করার উৎস ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করেছিল কর্নওআলিস প্রবর্তিত ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। নতুন ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে এদেশের সামন্ততন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। এই বন্দোবস্তের ফলে নতুন নতুন জমিদারের উদ্ভব হয়েছিল। শহুরে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁদের সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন কাজে ব্যয় না করে জমি কিনে জমিদার হয়ে বসেছিলেন। এইসব নতুন নতুন জমিদার সরকারের দেয় মেটাবার জন্য নির্মমভাবে কৃষকদের ওপর জুলুম চালাতেন, এছাড়া নিজেদের যাবতীয় খরচাও প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করতেন। ফলে এই নবপ্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থায় কৃষকসমাজ চতুস্পার্শ্বিক শোষণের যাঁতায় পিষ্ট হতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুসন্ধিৎসায় এইসব তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ অনুপ্রবিষ্ট করেন। তিনি জানতেন এই বন্দোবস্তের স্বরূপ। তাঁর মতে 'কর্ণওয়ালিস প্রজাদিগের হাত-পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন;জমীদার কর্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না'। এই কথাগুলির অব্যবহিত আগে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে লর্ড কর্নওআলিস এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছেন 'মহাভ্রমে পতিত' হয়ে। ওই 'মহাভ্রম'-এর কথা বলে তিনি কর্নওআলিসকে দোষমুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন! তিনি এরপর আবার জোর দিয়েই বলেছেন :

ইচ্ছা পূর্ব্বক ব্রিটিশ রাজপুরুষরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।... দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা বিদেশী; এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

এভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশি ইংরেজ রাজকর্তৃপক্ষকে দোষমুক্তির শংসাপত্র দিয়ে তাঁদের প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। নিপীড়িত কৃষকদের দুর্দশামোচনের লক্ষ্যে তিনি লিখছেন :

আমরা এই দীনহীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদের (ইংরেজ শাসকদের) নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি;তাঁহাদের মঙ্গল হউক।; ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় হউক। তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

লক্ষণীয়, কৃষকদের দুর্দশামোচনের জন্য ইংরেজ শাসকবর্গের কাছে 'রোদন' করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমত ইংরেজদের মঙ্গল কামনা করেছেন, তারপরে ব্রিটিশ শাসনের অক্ষয় কামনা করেছেন এবং তারপরে তিনি তাদের কাছে 'নিরুপায়' কৃষকদের প্রতি 'দৃষ্টিপাত' করতে অনুরোধ করেছেন। অর্থাৎ কৃষকস্বার্থ পরে এসেছে, আগে এসেছে রাজস্বার্থসেবা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে এত কথা বলা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এই বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেন নি। তিনি লিখেছেন :

১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছে, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া এই ভারতমন্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ ইংরাজদিগকে দিই না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এদেশের কৃষকসমাজের দুর্দশার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র এই 'ভ্রম' সংশোধনের পরিপন্থী। তাছাড়া এই বন্দোবস্ত নাকি ইংরেজরা 'সত্য প্রতিজ্ঞা' করে চিরস্থায়ী করেছেন, সুতরাং এই বন্দোবস্ত ধ্বংস হওয়ার অর্থ ইংরাজেরা সারাদেশে 'মিথ্যাবাদী' হিসেবে চিহ্নিত হবেন, প্রজাসাধারণের কাছে 'চিরকালের অবিশ্বাসভাজন' গণ্য হবেন;সুতরাং এরকম 'কুপরামর্শ' তিনি ইংরেজদের দিতে চান না!

এখানে অদ্ভুত স্ববিরোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গিয়েছে বঙ্কিম-দর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলছেন ইংরেজদের 'ভ্রম'-এর কারণে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছে, আবার বলছেন ইংরেজরা 'সত্য প্রতিজ্ঞা' করে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। একবার বলছেন এই বন্দোবস্তের

ফলে হাত-পা বেঁধে কর্নওয়ালিস কৃষকদের জমিদারের 'গ্রাসে' ফেলে অসীম দুর্দশার শিকার করেছেন, আবার বলছেন এই বন্দোবস্ত ধ্বংস হলে ইংরেজরা এইসব কৃষক প্রজাবর্গের কাছে 'চিরকালের অবিশ্বাসভাজন' হবেন। একবার বলছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের জীবনে স্থায়ী অন্ধকার নেমে এসেছে, আবার বলছেন এই বন্দোবস্ত ধ্বংস হলে সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এরকম অদ্ভুত বিরোধাভাসের যুক্তি মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তিনি বিচারকের মতোই রায় দিয়েছেন যে এই বন্দোবস্ত ধ্বংসের অনুমোদক তিনি নন, কারণ এই বন্দোবস্তের ধ্বংসের পরিণতিতে বাংলাদেশে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে;তিনি সমাজ বিপ্লবের বিরোধী! এই বিপ্লবভীতি বঙ্কিমমানসে নিদারুণ ক্রিয়াশীল থেকেছে। বিপ্লবকে যেকোনোভাবে আটকাতে তিনি বদ্ধপরিকর। লর্ড রিপনের উৎসবের জমা-খরচ-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন :

এখনকার নূতন সমাজ নেতৃগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সমাজ ধীরে ধীরে সুপথে চালাইলে, বিপ্লব না ঘটে।

৭

বঙ্কিমচন্দ্রের যে দর্শনবীক্ষা এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যশ্রেণীর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোত্তর নবজাত জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধিরা হাত ধরাধরি করে এদেশে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থ অভিন্নরূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এঁরা অনেকে প্রপীড়িত কৃষকদের দুর্দশামোচনে আগ্রহী হয়েছেন জমিদারতন্ত্র এবং ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রেখেই। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ-বিপন্নকারী ক্ষোভ বিদ্রোহে এঁরা অনুমোদন দেননি, বরং সেই বিদ্রোহদমনে রাজশক্তির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মধ্যশ্রেণীর যে নেতৃত্ব ১৮৬০-এর নীল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সামনে উঠে এসেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন যথেষ্ট সর্তকতার সঙ্গেই।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল'। একথা সমসময়ের প্রখ্যাত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'-র সম্পাদক অকৃত্রিম কৃষকদরদি কাঙাল হরিনাথ মজুমদার একটু অন্যভাবে বারবার বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য : জমিদার ও প্রজার মধ্যেকার 'বিবাদ ভঞ্জনের' একমাত্র উপায় হচ্ছে 'জমীদারের সহিত প্রজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। তিনি আদালতের বাইরে জমিদার ও প্রজার মধ্যে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার সূত্রসন্ধানে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আরও নির্দিষ্ট বক্তব্য :

বস্তুতঃ গভর্নমেন্টের সহিত জমিদারদিগের যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে প্রজার সহিত জমিদারদিগের তদ্রুপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলে গোলোযোগ একেবারে নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

নিপীড়িত নির্যাতিত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের সংগ্রামের শরিক হয়ে জীবন বিপন্ন করেও যিনি পথচ্যুত, সত্যভ্রষ্ট হননি, সমসময়ের সেই গ্রামবার্তা-সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য নীরবতা বিস্ময়কর। কৃষকদের দুর্দশামোচনের জন্য ভাবিত বঙ্কিম সমসময়ের এই লড়াকু কৃষকদরদি সম্পর্কে জানতেন না, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বঙ্কিমের লেখায় হরিনাথ কোথাও উল্লেখিত হননি।

তবে কাঙাল হরিনাথের এই বক্তব্য সমসময়ে প্রতিফলিত হয়েছিল কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখের চিন্তাচর্চা ও বক্তব্যে। এইসব আলোচনার পরিণতিতেই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই আইনের কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করে বলেছেন যে এই আইনে কৃষকদের 'উন্নতি সাধিত' হয়েছে। কিন্তু এই আইন ভূমিব্যবস্থার মূল কাঠামোকে কতটা রূপান্তরের সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নীরব। অধ্যাপক অমলেন্দু দে যথার্থই বলেছেন : প্রকৃতপক্ষে এই আইনের ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের মালিকানা স্বত্ব পুরোপুরি অটুট থাকে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে : এই অবস্থা বজায় রেখে কৃষকের দুরবস্থা কতটা লাঘব করা সম্ভব? কিন্তু এইসব প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্বিগ্ন করে তোলেনি। কী করে বিশ্বাস করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্যক্তি এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না?

একটা কথা মনে রাখা দরকার। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে জর্জ ক্যাম্বেল বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ রাজসরকারের অধীনে প্রথিতযশা আমলার দায়িত্বে আসীন। এই ক্যাম্বেল ছিলেন 'আয়ার্ল্যান্ডের ভূমিব্যবস্থার একদা গবেষক-ছাত্র কৃষকবন্ধু'। তৎকালীন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমেই ক্যাম্বেল কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে টিকিয়ে রেখেই কৃষকস্বার্থের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন। বাস্তবিক একইসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে টিকিয়ে রাখা এবং কৃষকস্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার এই যে ক্যাম্বেল নীতি;এতেই বঙ্কিমচন্দ্র উৎসাহিত হয়েছিলেন। এই পর্যায়েই তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখতে ও প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং ক্যাম্বেলের নীতির অনুসরণে নিজের যুক্তিচর্চায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তার বিষবৃক্ষকে অক্ষত রেখে কৃষকদের দুর্দশামোচনের ব্যালান্সশিট তৈরির প্রয়াস পেয়েছিলেন। আর এর অনিবার্য পরিণতি আমরা দেখেছি 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বঙ্কিম রচনাবলি (যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত)। দ্বিতীয় খণ্ড। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। ১৪০১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ।

২. বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (প্রধান সম্পাদক গোপাল হালদার), প্রবন্ধ খণ্ড। শেষ অংশ। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। কলকাতা। ১৩৮০ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। কলকাতা। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাম্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। কলকাতা। ১৪২৭ বঙ্গাব্দ সংস্করণ।

৫. প্রভাতকুমার গোস্বামী : উনিশ শতকের দর্পণ নাটক। শুকসারী প্রকাশক। কলকাতা। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।

৬. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
৭. অমলেন্দু দে : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী। রত্না প্রকাশন। কলকাতা। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
৮. অলোক রায় : প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ। বাগর্থ। কলকাতা। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
৯. অলোক রায় : উনিশ শতক। এস.পি.পি.। বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ১৪০২ বঙ্গাব্দ সংস্করণ।
১০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক। চিরায়ত প্রকাশন। কলকাতা। ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ সংস্করণ।
১১. অশোক চট্টোপাধ্যায়: উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন কাঙাল হরিনাথ ও 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'।
উবুদশ। কলকাতা। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
১২. সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত : বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক'। উৎসের সন্ধানে। অনীক পত্রিকা। ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯০
১৩. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পাদিত)। বঙ্কিম প্রসঙ্গ। নবপত্র প্রকশন। কলকাতা। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
১৪. বদরুদ্দিন উমর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক। চিরায়ত প্রকাশন। কলকাতা। ১৪০০ বঙ্গাব্দ সংস্করণ।
১৫. অশোক চট্টোপাধ্যায় : প্রাক ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজ। লেখক সমাবেশ। কলকাতা। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
১৬. সুপ্রকাশ রায় ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। ডি.এন.বি.এ.। কলকাতা। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
১৭ কার্ল মার্কস : নোটস অন ইন্ডিয়ান হিস্টরি। প্রগ্রেস পাবলিশার্স। মস্কো। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ।
RW/ September ২৭-২৮, ২০২৬



তানিয়া
এন্টারপ্রাইজ



এখানে বাড়ী তৈরীর উৎকৃষ্ট মানের যাবতীয় সরঞ্জাম পাইকারী ও খুচরা পাওয়া যায়।

প্রোঃ- প্রশান্ত সরকার

৪নং স্কীম, অশোকনগর, (রবীন্দ্র সংঘের কাছে),
উত্তর ২৪ পরগনা

মোঃ **8944890722 / 9851264264**

লিটল ম্যাগাজিনের প্রাতিষ্ঠানিকতা ও একটি সমবেত আর্তনাদের খসড়া

অপূর্ব সাহা

'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৩ সালে 'সাহিত্যপত্র' প্রবন্ধে লিটল ম্যাগাজিন শব্দটি হাজির করে বলেছিলেন, 'নজরটা যাদের উঁচুর দিকে' আর যেসব পত্রিকা পাঠ শেষে রেলগাড়ির কামরায় ফেলে রাখা চলে না। তাঁর মতে, লিটল ম্যাগাজিন হলো 'এক জোড়া মলাটের মধ্যে সব-কিছুর আমদানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।' সময়ের সেবা না করে সময়কে সৃষ্টি করার চেষ্টাই হলো লিটল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম। স্বভাবতই লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্র ব্যাখ্যায় 'প্রতিষ্ঠান বিরোধী', 'গোষ্ঠীচেতনা', 'যৌথতা', 'স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে চেতনাপ্রবাহের সংগ্রাম' ইত্যাদি নানান শব্দবন্ধ ভিড় করে আসে। জনমনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার ধারাবাহিক লড়াইয়ের ইতিহাস ও লিটল ম্যাগাজিনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে গুণীজনের মতামত পর্যালোচনা করে আমাদের মনে হয়েছে, লিটল ম্যাগাজিন হবে;

১. পুঁজির স্বল্পতা হেতু অবাণিজ্যিক।

২. তার প্রতিষ্ঠানবিরোধী চরিত্র থাকবে। অর্থাৎ সমাজপ্রচলিত নানা নীতি নৈতিকতা, ট্যাবু, গড্ডলিকাপ্রবাহের বিরুদ্ধে ভাষা ব্যবহার, বিষয় ভাবনা, তদনুযায়ী নিজেকে বদলানো, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত ইচ্ছাপূরণের গল্পে সামিল না হওয়া।

৩. পরীক্ষানিরীক্ষামূলক রচনা অগ্রাধিকার পাবে।

৪. অনামী লেখকদের প্রাধান্য থাকবে।

৫. কয়েকজন শিল্পমোদী পরিবর্তনকামী মানুষের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হবে লিটল ম্যাগাজিন। প্রচ্ছদ, অলংকরণ, পাতার বিন্যাসে থাকবে নান্দনিকতার ছোঁয়া।

৬. সেইসঙ্গে স্বল্পায়ু এবং ক্ষুদ্রাকার হওয়াটা যেন লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে এক অবধারিত সত্য।

এহেন বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে একসময় প্রগতি সাহিত্যের ধ্বজা উড়িয়ে অগ্রণী, অরণি, নতুন সাহিত্য, নতুন পরিবেশ ইত্যাদি পত্রিকা সাম্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যদিও বুদ্ধদেব বসু প্রথম বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের শিরোপা তুলে দিয়েছেন সবুজপত্র-কে। সাহিত্যে আধুনিকতার বীজমন্ত্র অঙ্কুরিত হয়েছিল যেন বা এই পত্রিকাতেই। কেউ বলেন লিটল ম্যাগাজিনের প্রাণপ্রবাহের পূর্বসূরী কল্লোল গোষ্ঠী, কেউ বা বঙ্গদর্শনকে সেই সম্মান দিতে আগ্রহী। বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার বাঁকবদলে বরাবর অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও লিটল ম্যাগাজিন। শুধুমাত্র কবিতাকেন্দ্রিক পত্রিকা হিসেবে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা (১৯৩৫) পত্রিকা হাজারো কবির আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। ১৯৬০-৭০-এর দশক জুড়ে হাংরি-শ্রুতি-শাস্ত্রবিরোধী-নিম সাহিত্য ধ্বংসকালীন, ছাঁচ ভেঙে ফেলো ইত্যাদি সাহিত্য আন্দোলনকে ধারণ করেছিল নানান লিটল ম্যাগাজিন। জিরাফ, ক্ষুধার্ত, জেব্রা, ফুঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বকাল ইত্যাদি লিটল ম্যাগাজিনে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকারীরা প্রচলিত মূল্যবোধকে যেমন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, পাশাপাশি এই দশক পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। শাস্ত্রবিরোধীদের মতে, লেখককে হতে হবে আঙ্গিক সচেতন এবং তিনি দৈবজ্ঞ নন বলেই শুধু নিজের কথা বলার অধিকারী। ১৯৬৮ সালে শ্রুতি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'আমরা বিশ্বাস করি কবিতা হয়ে ওঠা ছাড়া কবিতার আর কোন চেষ্টা বা উদ্দেশ্য নেই। কোনো বাণী, বিধান বা নীতিপ্রচারের দায়িত্ব কবিতার নয়।' প্রায় একই সময়ে সাম্প্রতিক পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল ধ্বংসকালীন আন্দোলন। অন্যদিকে যৌথতাকে আন্দোলনের রূপ দান করেছিল কৃত্তিবাস পত্রিকা।

রুচিশীল, নিষ্ঠা সহকারে প্রকাশিত হয়েছে পরিচয়, বারোমাস, এক্ষণ, সমকালীন, বিভাব, কলকাতা, কবিতাকথা, ফিনিক্স, পূর্বদেশ গল্পপত্র, একা এবং কয়েকজন, শতভিষা, সুন্দরম, লা পয়েজি ইত্যাদি লিটল ম্যাগাজিন। আবার কৃষ্ণগোপাল মল্লিক সম্পাদিত গল্পকবিতা নিজেই এক আন্দোলন। তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল গল্পকবিতা।

একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে লিটল ম্যাগাজিনের আশ্রয়ে চিহ্নিত হয়েছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অবনী ধর, মানিক চক্রবর্তী, অরূপরতন বসু, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব দাশগুপ্ত, উদয়ন ঘোষ, সুবিমল বসাক, সুভাষ ঘোষ, অজিত রায়, সুবিমল মিশ্র, রবি সেন, আশিস ঘোষ, অমল চন্দ, রমানাথ রায়, অতীন্দ্রিয় পাঠক প্রমুখ অসংখ্য গদ্যকার। আর ফাল্গুনী রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, মণীন্দ্র গুপ্ত, পুষ্কর দাশগুপ্ত, শম্ভু রক্ষিত, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে খুঁজে পাওয়া যাবে লিটল ম্যাগাজিনের অন্দরেই। আবার সত্তর দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাতে উদ্দীপিত অনুষ্টুপ, অনীক, প্রস্তুতিপর্ব, শিস, বোবাযুদ্ধ, সত্তর দশক, বর্তিকা, কালধ্বনি ইত্যাদি পত্রপত্রিকার সামাজিক দায়বদ্ধতাও ঈর্ষণীয়। কৌরব, বিজ্ঞাপন পর্ব, জারি বোবাযুদ্ধ, বিষয়মুখ ইত্যাদি পত্রিকা যত্ন নিয়ে প্রতিষ্ঠানবিরোধীদের লেখালেখিই ছাপিয়েছে।

যে সামাজিক অস্থিরতা সত্তর পূর্ববর্তী লেখকদের লিটল ম্যাগাজিন কেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলনে প্ররোচিত করেছিল, উত্তর সত্তরে তার ভাটার টান। আশাহীনতায় সকল উচ্চাশাই অনভিপ্রেত। কিন্তু প্রাক্ একবিংশ শতকে পেশাদারিত্ব জন্ম নিল ক্ষুদ্র পত্রিকার জগতে। আমার মনে হয় সমকালীন বেশিরভাগ পত্রিকার টিকি বাঁধা রয়েছে এক্ষণ পত্রিকার সুচারু পেশাদারিত্বের আঁচলে।

সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ, অলংকরণ, চিত্রনাট্যখচিত এক্ষণ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস ছাপা হয়েছে কমলকুমার মজুমদার (পিঞ্জরে বসিয়া শুক), অমিয়ভূষণ মজুমদার (ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর), অভিজিৎ সেনের (বর্গক্ষেত্র)। মনোজ মিত্রের নাটক (চাক ভাঙা মধু), সোমনাথ হোড়ের তেভাগার ডায়েরি, সিদ্ধার্থ ঘোষের ছবি তোলা: বাঙালির ফোটোগ্রাফি

চর্চা সহ মেয়েদের স্মৃতিকথা, ডায়েরি, অপ্রকাশিত লেখা, পুরোনো গ্রন্থের সটীক পুনর্মুদ্রণ, চিত্রনাট্য, পত্রিকা পরিচিতি ও রচনাপঞ্জি, পরিভাষা পরিচয়, বিদেশী সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে অসংখ্য লেখা ছেপেছেন এক্ষণ সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য। একইসঙ্গে পিছনের মলাটে বিজ্ঞাপন ছিল;এ যুগের নখদর্পণ 'দেশ' পত্রিকা।

মূলত তার উত্তরসূরীরাই পুনর্মুদ্রণ, পুরাতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, আত্মকথা, বিদেশী তত্ত্ব, নারীবাদ, বাংলা সাহিত্য সমালোচনা, নাটক, কবিতা, অনুবাদ, সাম্প্রতিক বিষয়, ছোটগল্প, বিশেষ ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস বা আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক পত্রপত্রিকার প্রকাশক বা সম্পাদক। ইতোমধ্যে মুদ্রণ সংস্কৃতিতে বিপ্লব ঘটে গেছে বলা চলে। এখন আর সন্ধেবেলা অফিসফেরতা ঘুপচি লেটারপ্রেসে মুড়ি চপ খেতে খেতে গালিপ্রুফে চোখ বোলাতে হয় না। ছবির ব্লক বানাতে ছুটতে হয় না কোথাও। উজ্জ্বল একঝাঁক ঝাঁ চকচকে ছোট পত্রিকা বিষয়নির্ভর, তথ্যবহুল। বুকশেলফ, নিদেন পক্ষে স্টাডিরুমে শোভা পাবেই বিতর্কিকা, এবং অন্যকথা, মুখাবয়ব, নাইনথ কলাম, দিবারাত্রির কাব্য, কোরক, বলাকা, খোঁজ, বাঘের বাচ্চা, বাতিঘর, অহর্নিশ, এককমাত্রা, পদ্যপত্র, হাওয়া ৪৯, আদম, থির বিজুরি, সংবর্তক, তাঁতঘর, অবভাস, হরপ্পা, তথ্যসূত্র, বোধশব্দ, বৈশাখী, দশদিশি, স্বরান্তর, গল্পদেশ, পূর্বমেঘ, নয় দরজা, লোক, আলোচনাচক্র ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, বাংলাদেশ মিলিয়ে সহস্রাধিক ছোটপত্রিকার তুলনায় এই তালিকা নিতান্তই নগণ্য, অসম্পূর্ণও বটে। এইসব পত্রিকা প্রকাশমাত্র সংগ্রহ করেন গবেষকরা। কোনো কোনো পত্রিকা আবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী সংখ্যা নির্মাণ করে। অধ্যাপকরা লেখেন সানন্দে। UGC, ISSN, POD ইত্যাদির কবলে পড়ে এখন ছোট পত্রিকার চরিত্র বদলে যাচ্ছে।

এখানেই পাঠক সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন উঠে আসে। থির বিজুরি পত্রিকার দেশভাগ, সেকালের শিক্ষা, বঙ্গভঙ্গ, বাংলা বানান, পুরনো বই ইত্যাদি সংখ্যাগুলি পাঠক সমাজ ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'রূপান্তর'-এর মতো সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কাজ হলে কেবল নীরবতাই প্রাপ্য। আমার প্রশ্ন, তাহলে কি ছোটো কাগজের সম্পাদকও পাঠকের চাহিদা মতো বা বাজারের চাহিদা মতো সাহিত্যপণ্য সরবরাহ করবেন? হয়তো এ আমার একার সমস্যা নয়, তাহলে কোথায় রাখব আমাদের দায়?

আপাতভাবে সবই আছে। কিন্তু সম্পাদককেন্দ্রিক এইসব পত্রিকায় প্রাণটা কোথায় গেল? কোথায় গেল লিটল ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠান বিরোধী চরিত্র, মুক্ত চিন্তার প্ল্যাটফর্ম? সর্বাঙ্গে পেশাদারিত্ব নিয়ে আত্মপ্রচারমুখী আজকের বেশিরভাগ পত্রপত্রিকা।

পাঁচমেশালী দৈনিক সংবাদপত্রে দু'চার লাইন পরিচিতি লিখলে বর্তে যায়। যে নৈঃশব্দ্য, যে আপোষ চারপাশে, তারই প্রতিফলন যেন বা এমন পেশাদারিত্বে। ছোট পত্রিকার ঝোঁক এখন নিজস্ব প্রকাশনা তৈরির দিকে। বিশেষ সংখ্যা, কিছুদিন পর ব্যবসায়িক সংস্থা থেকে বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এমনকী কোনো কোনো ব্যবসায়িক প্রকাশনা একটি-দুটি পত্রিকাকে দৃষ্টিনন্দন করে ছাপিয়ে দিচ্ছে নিজেদের পয়সায়। লিটল ম্যাগাজিন এখন বিকল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে গিলে খাচ্ছে প্রতিষ্ঠান। বিবর্তনের এই বাঁকে দাঁড়িয়ে 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' নামটাই তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী আমি।

এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ছোট পত্রপত্রিকার উন্নতির স্বার্থে আমি কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি।

১. বাণিজ্যিক পত্রিকার কাছে সময়টাই মুখ্য। তা না হলে বাজার পাবে না। কিন্তু ছোট কাগজের ক্ষেত্রে সেই বাধ্যবাধকতা নেই। তাই দিনক্ষণ মেনে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক এইসব সময়ের বাঁধন তুলে দেওয়া উচিত। সম্পাদক অথবা সম্পাদনা পরিষদ যখন বুঝবেন তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে, তখনই প্রকাশিত হবে পত্রিকাটি। সুতরাং পত্রিকা হবে অনিয়মিত।

২. বিপণনের জন্য কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক, কর্মী, শুভানুধ্যায়ী মিলে কোনো বইয়ের দোকান, কিংবা স্টেশন চত্বরের হুইলার, নিদেনপক্ষে কারুর বাড়ির ঠিকানায় নিজেদের কাগজ, বইপত্র রাখুন। মাসে একবার চারটে টেবিল সাজিয়ে সমমনস্ক মানুষদের ডাকুন। সারাবছর ছোট কাগজের বইমেলা চলুক।

৩. ছোট কাগজের সব লেখাই হবে আমন্ত্রণমূলক। বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকের ফেসবুক পেজ বা 'দেশ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত আহ্বান থাকে; আমাদের আগামী সংখ্যার বিষয় এই। যারা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা অমুক তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান ইত্যাদি। আমার প্রস্তাব, বিষয় অনুযায়ী বিশেষজ্ঞদের খুঁজে বের করুন। কথা বলুন। সেইসব আমন্ত্রিত লেখায় কাগজের মান উত্তরোত্তর বাড়বে। শুধু বিজ্ঞাপন দিয়ে দায় সারলেই চলবে না। সম্পাদক আর সংকলক এক নন। বাংলা ভাষায় কে, কোথায়, কী লিখছেন, ভালো-মন্দ সবকিছুর খোঁজ রাখবেন সম্পাদক।

৪. ছোটপত্রিকায় সারাবছরে প্রকাশিত যাবতীয় লেখা থেকে বাছাই করে কবিতা/গল্প/প্রবন্ধের কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হোক। এজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের কয়েকজন নির্ভরযোগ্য পাঠককে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গড়ে তোলা প্রয়োজন। একসময় এককভাবে মণীন্দ্র গুপ্ত যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

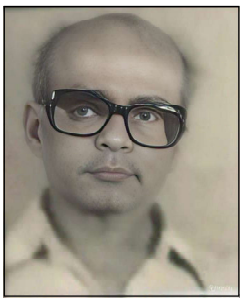
৫. গত কয়েক দশকে মুদ্রণপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। গালিপ্রুফ নেই, ভাঙা বা উল্টোনো টাইপ নেই, ব্লক তৈরি করে ছবি ছাপার যে অতিরিক্ত খরচ তা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে না। রঙিন ছবি ছাপানোও সাধ্যাতিরিক্ত নয়। তবু বহু পত্রিকার পাতা ওল্টালেই অযত্ন, কল্পনাশক্তির দারিদ্র্য চোখে পড়ে। প্রচ্ছদ, ক্যালিগ্রাফি, সূচিপত্র, সম্পাদকীয়, বিষয় বিন্যাস, বিজ্ঞাপনের স্থান নির্বাচন সব কিছু মাথায় রেখে পত্রিকা প্রকাশ করা উচিত। পাঠককে কী দিচ্ছেন সেটাই যথেষ্ট নয়, কীভাবে দিচ্ছেন তা নিয়েও ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে মাঝে মাঝে ছোট পত্রিকার জন্য মুদ্রণ কর্মশালার আয়োজন করা হোক। আগ্রহীরা যোগাযোগ করবেন। বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান পরামর্শে আমরা নিশ্চিত উপকৃত হব।

২০১৯ সালে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত বাংলা লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ক আলোচনা চক্রে প্রদত্ত বক্তৃতার মুদ্রিত রূপ।

ফায়ারম্যান

সুকুমার মিত্র

ভারতীয় রেলওয়ে: প্রতিরোধের একটি ইতিহাস



'একটি লোকোমোটিভের কয়লা এবং চালক উভয়কেই প্রয়োজন। মনে রেখো আমরা ছাড়া রেলওয়ে থেমে যাবে!' - এস.ডি. মিত্র

বিদ্রোহের ইঞ্জিন

এই গবেষণা গ্রন্থটি ভারতীয় রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলনের জাতীয় ইতিহাস-রচনার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, যা ঐতিহাসিকভাবে দলীয় রাজনৈতিকভাবে-সংযুক্ত ব্যক্তিত্বদের পক্ষে তৃণমূলস্তরের সংগ্রামী নেতৃত্বকে উপেক্ষা করেছে। কমরেড এস.ডি. মিত্র এবং দানাপুর ডিভিশনের মুঘলসরাই জংশন-কে কেন্দ্র করে রচিত হলেও লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (LRSA)-এর স্থপতি হিসেবে বইটিতে তাঁর মৌলিক ভূমিকা ও দানাপুর ডিভিশনের রেল শ্রমিক বিশেষত রানিং স্টাফদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং ট্রেড ইউনিয়ন নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে, বইটি শোষণমূলক, ঔপনিবেশিক-যুগের 'কন্টিনিউয়াস ডিউটি' (অবিরাম ডিউটি) ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লোকো রানিং স্টাফ (LRS)-এর সংগ্রামকে তুলে ধরে, যা রানিং স্টাফদের বিপজ্জনক ১৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার শিফটে কাজ করতে বাধ্য করতো। ১৯৬৮ সালের বিশ্বাসঘাতকতার পর, মিত্র ১৯৭০ সালে অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (AILRSA) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আঞ্চলিক ইউনিটগুলিকে একত্রিত করেন। এই সমিতি ছিল সংগ্রামী, গণতান্ত্রিক পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি শ্রেণী-নির্দিষ্ট সর্বভারতীয় ইউনিয়ন।

মিত্রের এই সংগঠন ১৯৭৪ সালের দেশব্যাপী রেল ধর্মঘটে চূড়ান্ত রূপ নেয়, যেখানে তিনি কৌশলগতভাবে মুঘলসরাই 'লোকো অবরোধ' (Loco Siege)-এর সমন্বয় করেন। এটি ছিল অহিংস নাশকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা জাতীয় পণ্য পরিবহন নেটওয়ার্ককে অচল করে দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। ব্যাপক দমন-পীড়ন, তাঁর নিজের গ্রেপ্তার এবং পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক নথি ও তথ্য কার্যত পরিস্থিতিগত কারণে সযত্নে না রাখায় মূল স্রোতের সংবাদ মাধ্যমের উপর মূলত নির্ভর করতে হয়েছে। সর্বভারতীয় রেল শ্রমিকদের এই আন্দোলন ৮-ঘণ্টার ডিউটি রুল সহ রানিং স্টাফদের অধিকারগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হয়।

বইটির উপসংহার এই যে, কমরেড এস.ডি. মিত্রের অরাজনৈতিক অর্থাৎ রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ অবস্থান, বিকেন্দ্রীকৃত মডেলটি বেসরকারিকরণ এবং অ্যালগরিদমিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমসাময়িক শ্রম আন্দোলনের জন্য একটি জরুরি নীলনকশা প্রদান করেছিলো। এটি জোর দিয়ে বলে যে, প্রকৃত কাঠামোগত পরিবর্তন প্রান্তিক অঞ্চলের শ্রমিকদের দৃঢ়তা থেকেই তৈরি হয়।

রেলওয়ে রানিং স্টাফ আন্দোলনে কমরেড এস.ডি. মিত্র কমরেড এস.ডি. মিত্র (যিনি রেল কলোনিতে 'মিত্র দাদা' নামে জনপ্রিয় ছিলেন)-এর নেতৃত্বে লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (LRSA)-এর উত্থান ভারতীয় রেল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। এটি আমলাতান্ত্রিক ইউনিয়নবাদ এবং রাষ্ট্রীয় দমন উভয়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্বাধীন, শ্রেণী-ভিত্তিক ইউনিয়নবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। মিত্রের এই সংগ্রাম মুঘলসরাই জংশনকে সংগ্রামী ইউনিয়নবাদের স্নায়ুকেন্দ্রে রূপান্তরিত করে এবং স্থানীয় প্রতিরোধকে সংহতি ও সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমন্বিত জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করে, যা জর্জ ফার্নান্ডেজের মতো জাতীয় নেতাদের আড়ালে ঢাকা পড়া আঞ্চলিক ভিত্তিগুলির গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।

ঐতিহাসিক শোষণ এবং LRSA-এর জন্ম (১৯৪৯-১৯৭০)

ভারতীয় রেলওয়ে শ্রমিক অসন্তোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল। ১৯৪৯ সালে ক্লিনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে স্পেশাল গ্রেড ড্রাইভার পর্যন্ত মিত্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে LRS কর্মীদের (ফায়ারম্যান, চালক) দৈনন্দিন কষ্ট-যেমন ১৬-৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত অতিরিক্ত ডিউটি, দুর্বল বিশ্রামাগার, 'অবিরাম ডিউটি সিস্টেম' এবং স্বেচ্ছাচারী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা-সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দেয়।

তৃণমূলস্তরের সংগঠন: ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, মিত্র তৎকালীন পূর্ব রেলওয়ের দানাপুর ডিভিশনে ফায়ারম্যান ও চালকদের সংগঠিত করতে গোপন চৌপাল-এর আয়োজন শুরু করেন। তিনি হাতে লেখা প্রচারপত্রের মাধ্যমে 'কিলার লিঙ্ক সিস্টেম' এবং মজুরি চুরি জনসমক্ষে আনেন। তাঁর 'কালা পাথর কা সচ' পুস্তিকাটি লোকো স্টাফদের মজুরি শোষণের তীব্রতা উন্মোচন করে।

স্বীকৃত ইউনিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা ও LRSA-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৬৮): ১৯৬৮ সালের ফায়ারম্যানদের ধর্মঘটে যখন AIRF এবং NFIR-এর মতো কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, রাজনৈতিকভাবে আপসকারী ইউনিয়নগুলি গোপনে ১৪-ঘণ্টার ডিউটি চুক্তিতে সম্মত হয়ে কর্মীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (LRSA) গঠিত হয়। LRSA একটি শ্রেণী-নির্দিষ্ট ইউনিয়ন হিসাবে উদ্ভূত হয়, যা প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণে বিশ্বাসী ছিল।

AILRSA-এর জন্ম (১৯৭০): ১৯৭০ সালের বিজয়ওয়াড়া সম্মেলনে, মিত্র এবং অন্যান্য আঞ্চলিক নেতাদের সহযোগিতায় LRSA থেকে অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (AILRSA) গঠিত হয়। এই পদক্ষেপটি খণ্ডিত স্থানীয় সংগ্রামগুলিকে একটি সুসংহত জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করে।

কৌশলগত বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রীয় দমন (১৯৭৩-১৯৭৫) : AILRSA-এর জন্ম রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার চেয়ে শ্রমিক কর্তৃত্বকে অগ্রাধিকার

দেয় এমন স্বাধীন ইউনিয়নগুলির দিকে একটি নির্ণায়ক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছিল।

বিদ্রোহের মঞ্চ (১৯৭৩): ১৯৭৩ সালের আগস্টে গণছুটি এবং ওয়ার্ক-টু-রুল কৌশলের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়, যা ১৯৭৪ সালের দেশব্যাপী রেল ধর্মঘটের মঞ্চ তৈরি করে।

মুঘলসরাইয়ের বিদ্রোহ (১৯৭৪): ১৯৭৪ সালের ১৪ মে, মিত্র মুঘলসরাইয়ে 'লোকো অবরোধ'-এর আয়োজন করেন। ইঞ্জিনের সেফটি ভালভ বিকল করা এবং লোকোমোটিভের চাবিগুলি লুকিয়ে ফেলা-র মাধ্যমে তিনি ৭২ ঘণ্টা ধরে ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ত মালবাহী কেন্দ্রটিকে অচল করে দেন। এই বিদ্রোহের মূল দাবিগুলির মধ্যে ছিল ডিউটির সময়সীমা নির্ধারণ এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকার জন্য ন্যায়সঙ্গত মজুরি।

দমন ও প্রতিরোধ: এই আন্দোলন চরম রাষ্ট্রীয় দমন ও আইনি কাঠামো (যেমন MISA)-এর শিকার হয়। MISA-এর অধীনে গণগ্রেপ্তার সত্ত্বেও, AILRSA-এর ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্কগুলি আন্দোলনকে সচল রেখেছিল। মিত্র রেলওয়ে কলোনির নারী ও শিশুদের নিয়ে সহায়তার নেটওয়ার্ক তৈরি করে সম্প্রদায়গত সংহতি গড়ে তোলেন। তাঁর স্লোগান-'হার নেহি মানেঙ্গে!'-উত্তর প্রদেশ জুড়ে রণধ্বনিতে পরিণত হয়।

ধর্মঘট-পরবর্তী সুসংহতকরণ ও স্থায়ী উত্তরাধিকার (১৯৭৫-১৯৮০): চরম রাষ্ট্রীয় চাপের মুখে ধর্মঘট দমন হলেও, AILRSA কৌশলগত সুসংহতকরণের মাধ্যমে নীতিগত বিজয় অর্জন করে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুসংহতকরণ: AILRSA বিভাগীয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করে, কর্মী প্রশিক্ষণ দেয় এবং সংবিধানকে আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে। মিত্র মুঘলসরাইয়ে একটি 'লাইব্রেরি আন্দোলন' (১৯৭৫-৭৭) তৈরি করেন, যেখানে গোপনে ইউনিয়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা চলত এবং ক্লান্তি-জনিত দুর্ঘটনার রেকর্ড করা হতো।

নীতিগত সংস্কার: AILRSA-এর অবিরাম ওকালতির ফলে ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে কাজের সময়সীমা সীমিত করা, ট্রিপগুলির মধ্যে নিশ্চিত বিশ্রাম, ক্লান্তি সুরক্ষার প্রোটোকল, স্বচ্ছ ও ন্যায্য রানিং অ্যালাউন্স পুনর্বিবেচনা এবং চিকিৎসা ও পেনশন সুবিধার সম্প্রসারণ-এর মতো রূপান্তরমূলক সংস্কার এসেছিল।

উত্তরাধিকারের প্রাসঙ্গিকতা: মিত্রের অবদানগুলি মূলধারার শ্রম ইতিহাস-রচনায় উপেক্ষিত হলেও, AILRSA আজও ভারতীয় শ্রম ইতিহাসে সবচেয়ে সহনশীল এবং শ্রেণী-কেন্দ্রিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে একটি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মাটি-সংলগ্ন, সংগ্রামী, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বের শৈলী তৃণমূল সংহতির গুরুত্বকে তুলে ধরে এবং আজকের বেসরকারিকরণ, স্বয়ংক্রিয়করণ এবং শ্রমিক সুরক্ষার ক্ষয়-এর মতো চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক।

শ্রেণী-ভিত্তিক ইউনিয়নবাদের জয়

কমরেড এস.ডি. মিত্রের নেতৃত্বে লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (LRSA)-এর উত্থান ভারতীয় রেল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা শ্রেণী-ভিত্তিক ইউনিয়নবাদের বিজয়কে চিহ্নিত করে। মিত্র, একজন লোকো চালক হিসেবে তৃণমূলস্তর থেকে উঠে এসে, মুঘলসরাই জংশনকে সংগ্রামী ইউনিয়নবাদের স্নায়ুকেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছিলেন, যা আমলাতান্ত্রিক অবহেলা এবং দমনমূলক রাষ্ট্রীয় নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

বিদ্রোহের ভিত্তি স্থাপন: LRSA-এর জন্ম ও আদর্শ (প্রাক-১৯৭৩) লোকো রানিং স্টাফ (LRS) কর্মীরা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের গভীরে প্রোথিত শোষণমূলক কাজের পরিবেশের শিকার হতেন। তাঁদের প্রধান অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল: ১২-১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ডিউটি, 'অবিরাম ডিউটি সিস্টেম', ৭২-ঘণ্টা পর্যন্ত ডিউটি, এবং অন্যায্য রানিং অ্যালাউন্স।

তৃণমূলস্তরের সংগঠন: ১৯৬৫ সাল থেকেই মিত্র মুঘলসরাই লোকো শেডের কাছে গোপন চৌপাল-এর আয়োজন শুরু করেন। তিনি হাতে লেখা প্রচারপত্রের মাধ্যমে 'কিলার লিঙ্ক সিস্টেম' এবং মজুরি চুরি জনসমক্ষে আনেন।

বিশ্বাসঘাতকতা ও LRSA-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৬৮): ১৯৬৮ সালের ফায়ারম্যানদের ধর্মঘটে যখন বৃহত্তর ফেডারেশনগুলি কর্মীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন তা লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (LRSA)-এর জন্মকে ত্বরান্বিত করে। LRSA একটি শ্রেণী-নির্দিষ্ট ইউনিয়ন হিসাবে উদ্ভূত হয়, যা আমলাতান্ত্রিক স্থবিরতা এবং রাজনৈতিক আপসকারী মূলধারার ইউনিয়নগুলির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

রাষ্ট্রীয় দমন: LRSA-এর সক্রিয়তার প্রতিক্রিয়ায় রেল ও প্রতিরক্ষা আইনের অধীনে সাসপেনশন, বদলি এবং গ্রেপ্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুলস-এর মতো আইনি কাঠামো ব্যবহার করে শ্রমিক সক্রিয়তাকে নাশকতামূলক হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।

জাতীয় সংহতি ও কৌশলগত প্রতিরোধ (১৯৭০-১৯৭৪): নিপীড়ন সত্ত্বেও, LRSA-এর আদর্শগত ভিত্তি আরও দৃঢ় হয় এবং স্বাধীন, শ্রেণী-নির্দিষ্ট ইউনিয়নবাদের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরদার করে।

AILRSA-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৭০): ১৯৭০ সালের বিজয়ওয়াড়া সম্মেলনে, মিত্র এবং অন্যান্য আঞ্চলিক নেতাদের সহযোগিতায় LRSA থেকে অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (AILRSA) গঠিত হয়। এই ইউনিয়নটি শ্রেণী-ভিত্তিক ওকালতি এবং প্রত্যক্ষ পদক্ষেপের উপর জোর দেয়।

MISA এবং প্রতিরোধ: অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা আইন (MISA)-এর অধীনে গণগ্রেপ্তার সত্ত্বেও, AILRSA-এর ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্কগুলি আন্দোলনকে সচল রেখেছিল। মিত্র রেলওয়ে কলোনির নারী ও শিশুদের নিয়ে সম্প্রদায়গত সংহতি গড়ে তোলেন। তাঁর দর্শন গান্ধীবাদী নীতিশাস্ত্রকে মার্কসবাদী পদ্ধতির সাথে মিশ্রিত করেছিল, যার স্লোগান ছিল-'হার নেহি মানেঙ্গে!'

ধর্মঘট-পরবর্তী বিজয় ও স্থায়ী উত্তরাধিকার (১৯৭৫-১৯৮০) চরম রাষ্ট্রীয় চাপের মুখে ধর্মঘট দমন হলেও, AILRSA তার গণতান্ত্রিক সংহতি এবং তৃণমূলস্তরের কাঠামো থেকে শক্তি নিয়ে স্থায়ী নীতিগত

বিজয় অর্জন করে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুসংহতকরণ: AILRSA বিভাগীয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করে, কর্মী প্রশিক্ষণ দেয় এবং সংবিধানকে আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে। মিত্র মুঘলসরাইয়ে একটি 'লাইব্রেরি আন্দোলন' (১৯৭৫-৭৭) তৈরি করেন, যেখানে গোপনে ইউনিয়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা চলত এবং ক্লান্তি-জনিত দুর্ঘটনার রেকর্ড করা হতো।

নীতিগত সংস্কার: AILRSA-এর অবিরাম ওকালতির ফলে ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে কাজের সময়সীমা সীমিত করা (৮-ঘণ্টার কর্মদিবসের দাবি), ট্রিপগুলির মধ্যে নিশ্চিত বিশ্রাম, ক্লান্তি সুরক্ষার প্রোটোকল, স্বচ্ছ ও ন্যায্য রানিং অ্যালাউন্স পুনর্বিবেচনা এবং চিকিৎসা ও পেনশন সুবিধার সম্প্রসারণ-এর মতো রূপান্তরমূলক সংস্কার এসেছিল।

উত্তরাধিকার: AILRSA আজও ভারতীয় শ্রম ইতিহাসে সবচেয়ে সহনশীল এবং শ্রেণী-কেন্দ্রিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে একটি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। মিত্রের উত্তরাধিকার গণতান্ত্রিক সংহতি এবং তৃণমূলস্তরের সংগঠনের গুরুত্বকে তুলে ধরে, যা আজকের বেসরকারিকরণ ও শ্রমিক সুরক্ষার ক্ষয়-এর মতো নতুন চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক। তাঁর সংগ্রামী জীবন রেল শ্রমিকদের মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি এবং উন্নত কাজের পরিবেশের জন্য নিরন্তর সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

বামপন্থী দলগুলির বিশ্বাসঘাতকতা

ধর্মঘট আনুষ্ঠানিকভাবে ২৮ মে, ১৯৭৪-এ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। ধর্মঘট প্রত্যাহারের সময় রেল ইউনিয়নগুলি শ্রীমতী গান্ধীর আপসহীন অবস্থানের কাছে নতি স্বীকার করে বলেছিল যে 'সরকার মিনি যুদ্ধ করেছে' এবং 'এ ধরনের সংঘর্ষে প্রতিকূলতা কর্মীদের বিরুদ্ধেই যায়।' ইউনিয়ন নেতারা বলেন, পরিস্থিতি 'গভীর বিবেচনা' করে এবং 'আন্দোলন দীর্ঘায়িত করার অর্থনৈতিক পরিণতির' পরেই ধর্মঘট শেষ করা হয়। তাঁরা সরকারকে জেল থেকে সকল রেলকর্মীকে মুক্তি দিতে এবং ধর্মঘটের সময় যাঁদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল, তাঁদের পুনর্বহাল করার জন্য অনুরোধ জানান।

নেতৃত্বের প্রধান অবলম্বন যে তিনটি দল সোশ্যালিস্ট পার্টি, সিপিআই এবং সিপিআই(এম) তাদের সংস্কারবাদী এবং দোদুল্যমান মনোভাব এই উত্থানকে শ্রমিক শ্রেণির অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেয় এবং চেয়েছিল যে, সংগ্রামটি ট্রেড ইউনিয়ন আলোচনার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য শিল্প বিরোধের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। এটি ভারতীয় রাষ্ট্রকে ধর্মঘটকারীদের উপর প্রবলভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয়।

নেতৃত্বের অস্থির ও দায়িত্বজ্ঞানহীন চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন ধর্মঘট শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এই তিনটি দলের নেতারাই গ্রেপ্তার এড়াতে ভূগর্ভে চলে যান এবং ফলে তাঁরা মাঠপর্যায়ের সংগঠক ও কর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হন, যখন অন্য অংশটি ছিল কারাগারের প্রাচীরের ভেতরে।

আশ্চর্যজনকভাবে, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (সিপিআই) এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)-এর মতো কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক নেতৃত্ব নতি স্বীকার করে এবং ধর্মঘটের গতি কমাতে একটি দ্রুত আলোচনা সাপেক্ষ নিষ্পত্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটি কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও মনোবলহীনতা সৃষ্টি করে এবং সাথে সাথে নিজস্ব ইউনিয়নগুলির প্রতি অবিশ্বাসও তৈরি করে। এই দুটি দল একদিকে রেল কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উত্থানকে একটি সংগঠিত রূপ দিতে এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিপীড়নমূলক আক্রমণের মোকাবিলা করতে রেল ধর্মঘটীদের সমর্থনে গণসংগঠন ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে জড়িত করে একটি গণ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আসেনি। ধর্মঘট আনুষ্ঠানিকভাবে ২৮ মে, ১৯৭৪-এ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। অনেকেই মনে করেছিলেন যে, কর্মীদের কোনও তাৎক্ষণিক অর্জন ছাড়াই ধর্মঘটটি সফলভাবে দমন করা হয়েছে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর শিরোনাম ছিল, 'ভারতীয় রেল ধর্মঘট পতনের মধ্য দিয়ে শেষ'।

বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত

ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৬৮, মুঘলসরাই জংশন ধর্মঘট ফায়ারম্যান এবং সহকারী চালকরা অত্যাধিক ডিউটির সময় এবং রানিং অ্যালাউন্স ব্যবস্থার সাথে যুক্ত অন্যায্য মজুরি কাঠামোর প্রতিবাদে মুঘলসরাই জংশনে একটি সমন্বিত ধর্মঘট শুরু করে। এটি ভারতীয় রেলওয়ের প্রথম শ্রেণী-নির্দিষ্ট শ্রমিক আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি ছিল এবং লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (LRSA)-এর উত্থানের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৬৮, পূর্ব রেলওয়ে জুড়ে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে; প্রতিবাদ দানাপুর, আসানসোল এবং হাওড়া সহ বিভিন্ন ডিভিশনে তীব্র হয়। মালবাহী এবং যাত্রীবাহী পরিষেবা ব্যাহত হয় এবং রেলওয়ে বোর্ড আলোচনা করতে অস্বীকার করে। AIRF এবং NFIR-এর আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্বাধীন সংগঠনের প্রচেষ্টা গতি লাভ করে।

মার্চ ১, ১৯৬৮, LRSA-এর উত্থান এবং ফেডারেল ইউনিয়নগুলির বিশ্বাসঘাতকতা: AIRF এবং রেলওয়ে বোর্ড ১৪-ঘণ্টার ডিউটি চুক্তি চাপিয়ে দিয়ে ধর্মঘটকারী ফায়ারম্যানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কমরেড এস.ডি. মিত্র মুঘলসরাই কর্মীদের সেই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার জন্য একত্রিত করেন এবং এটিকে 'পিঠে ছুরি মারা' বলে অভিহিত করেন। এই মুহূর্তটি LRSA-এর তৃণমূল বিশ্বাসযোগ্যতাকে সুসংহত করে এবং মিত্রকে একজন সংগ্রামী সংগঠক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৭০ - AILRSA গঠন: ফেডারেল ইউনিয়নগুলির প্রতি ব্যাপক মোহভঙ্গের পর, মিত্র সহ LRSA-এর নেতারা বিজয়ওয়াড়া সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (AILRSA)-এর প্রতিষ্ঠাতা সনদ রচনা করেন। নতুন জাতীয় প্ল্যাটফর্মের জন্য মুঘলসরাই একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

১৯৭১-১৯৭৩ , শ্রমিকদের নথিবদ্ধকরণ এবং সুরক্ষা ওকালতি:

মিত্র ক্লান্তি-জনিত দুর্ঘটনা এবং অনিরাপদ কর্মপরিবেশ নথিবদ্ধ করার প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেন। এই উপাদানগুলি ভবিষ্যতের সুরক্ষা সংস্কারের ভিত্তি তৈরি করে এবং LRSA-এর সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করে।

আগস্ট ১৯৭৩- ডিউটির সময় নিয়ে সমন্বিত প্রতিবাদ:

রেল মন্ত্রকের প্রতিশ্রুত ১০-ঘণ্টার কর্মদিবস বাস্তবায়নে ব্যর্থতার কারণে মিত্র দানাপুরে গণছুটি এবং ধীরগতি সংগঠিত করেন। যদিও প্রতিবাদটি সংক্ষিপ্ত ছিল, এটি রেলওয়ে পরিচালনার দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং বৃহত্তর পদক্ষেপের জন্য কর্মীদের উদ্যমী করে তোলে।

মে ৮-১৪, ১৯৭৪ মুঘলসরাই লোকো অবরোধ

কৌশলগত নাশকতা: বর্ণিত পদ্ধতিগুলি (ইঞ্জিন বিকল করা, চাবি পুঁতে রাখা, ট্র্যাকে তেল দেওয়া) ছিল সারা ভারতে লোকো স্টাফদের দ্বারা ধর্মঘটের সময় ব্যবহৃত চিরাচরিত, কম-ঝুঁকিপূর্ণ, উচ্চ-প্রভাবের অসহযোগিতা কৌশল। যন্ত্রপাতির প্রতি তাদের গভীর জ্ঞান কোনো স্থায়ী ক্ষতি না করেই অপারেশনগুলিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করতে সাহায্য করেছিল।

মুঘলসরাইকে লক্ষ্য করা: মালবাহী ও কয়লা ট্র্যাফিক অচল করতে মুঘলসরাইকে (ভারতের বৃহত্তম মার্শালিং ইয়ার্ড) লক্ষ্যবস্তু করা ছিল কৌশলগতভাবে সঠিক। সরকারের উপর সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের জন্য এই কেন্দ্রটিকে বিকল করা অপরিহার্য ছিল।

মে ১৮, ১৯৭৪- মিত্রের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন

বারাণসীর জেলে আটক এস.ডি মিত্রকে নির্যাতন করা হয়। তিনি ধর্মঘট ভাঙতে অস্বীকার করেন এবং রক্ষীদের বলেন, 'আমাকে গুলি করুন, কিন্তু আমি ধর্মঘট ভাঙব না।'

১৯৭৫-১৯৭৭- ভূগর্ভস্থ প্রতিরোধ ও শ্রমিক শিক্ষা:

গ্রেড-৪ ট্র্যাকম্যানে পদাবনতি হওয়া মিত্র মুঘলসরাইয়ের কাছে একটি চায়ের দোকান থেকে একটি গোপন 'লাইব্রেরি আন্দোলন' পরিচালনা করেন। তিনি কর্মীদের ক্লান্তি-সম্পর্কিত ঘটনা নথিবদ্ধ করতে প্রশিক্ষণ দেন এবং ভূগর্ভস্থ সংগঠনের মাধ্যমে LRSA-এর গতি বজায় রাখেন।

১৯৮০-এর দশক সংস্কারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

মিত্রের নথিবদ্ধকরণের প্রচেষ্টা ৮-ঘণ্টার ডিউটি বিধি বাস্তবায়ন এবং বিশ্রামের কেবিনগুলির স্বীকৃতিতে অবদান রাখে। সরাসরি ইউনিয়ন নির্বাচনের জন্য তাঁর ওকালতি এবং বেসরকারীকরণের বিরোধিতা AILRSA-এর দীর্ঘমেয়াদী কৌশলকে রূপ দিয়েছিল।

২০০৪ - মৌখিক ইতিহাস এবং সাক্ষ্য

পরিবারের সদস্য এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা, যার মধ্যে সুকুমার মিত্রও ছিলেন, ১৯৭৪ সালের ধর্মঘট এবং এর প্রভাবের ব্যক্তিগত বিবরণ ভাগ করে নেন। এই সাক্ষ্যগুলি মিত্রের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করে এবং প্রতিরোধের মানবিক মূল্যকে তুলে ধরে।

তথ্যসূত্র ও উৎস সামগ্রী:

সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক নথি/রেকর্ড

Ministry of Labour, Government of India. Annual Reports on Industrial Relations and Labour Conditions.

Railway Board. Proceedings and Circulars. National Archives of India, New Delhi.

Indian Labour Yearbook (1968), Ministry of Labour.

Lok Sabha Debates (March 6, 1968), Session 13, Debate No. 17, Page 176.

আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে কভারেজ (১৯৬৮)

The Indian Nation (Patna), February 12, 1968, "Firemen Strike Cripples Mughalsarai Junction."

The Statesman (Calcutta), February 15, 1968, "Loco Staff Strike Spreads to Eastern Railways."

The Searchlight (Bihar), March 1, 1968, "Railway Board-AIRF Pact Betrays Firemen."

সর্বভারতীয় সংগঠন তৈরি

AILRSA Founding Charter (Vijayawada Conference, 1970).

ধর্মঘট ও দমন (১৯৭৩-১৯৭৫)

Railway Board Labour Unrest Files (1973-75), National Archives, Delhi.

Jansatta (April 28, May 20, 1974): Reports on women's protest squads and Mitra's detention.

The Indian Express (May 15, 1974)- "Unprecedented paralysis at Mughalsarai."

The Statesman (June 10, 1974), "Hunger strike spreads in Varanasi Jail.".

Stephen Sherlock, The Indian Railways Strike of 1974 (1990).

ভূগর্ভস্থ প্রতিরোধ ও স্বীকৃতি

AITUC Publications– The Indian Workers (1960s-1970s).

Economic and Political Weekly (Various issues).

মৌখিক ইতিহাস ও সমসাময়িক প্রতিফলন

Com. S.D. Mitra's Remembrance While Chatting on a Hospital Bed July, 2013.

Smt. Padma Rani Mitra W/o. Late Com. S.D.Mitra, Juthika Mitra, elder daughter of Com.S.D. Mitra

Groundxero, May 7, 2024, "The Historic Nation-wide Railway Strike of May 1974" by Harsh Thakor.

শ্রীভূমি কসমেটিক্স

এখানে সকল প্রকার কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অর্ডার অনুযায়ী সাপ্লাই করা হয়।

ফোনে বা হোয়াটস্‌অ্যাপে যোগাযোগ করুন

প্রবীর সাহা - 9332480919

মধুমেহ

অর্চনা দে বিশ্বাস

দমদম সেন্ট্রাল জেলের গেটের বাইরে এসে দাঁড়ায় শ্রমণ। বন্ধুদের দেখে হাসে—অবশেষে মুক্তি

বন্ধুরা ম্লান হাসে—ভালো আছো?

—হ্যাঁ বহাল তবিয়তে। আরে জেলারকে এতদিন বিজ্ঞান পড়িয়েছি।

কলিগ সন্দীপ মৃদু হাসে—বাহ্

দুমাস আকাশ দেখিনি শ্রমণ। ঘুপচি ঘরে বন্দি ছিল। আজ মুক্ত হল তবে কেস থেকে নয়। শুধু জামিন পেয়েছে। দুজন কলিগ এসেছে নিতে। না শ্রাবণী আসেনি। শ্রাবণীর সামনে দাঁড়াতে হবে ভেবেই রক্তের ভিতর একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল—

—বৌদি এলনা?

—না বৌদিকে বলেছিলাম। কিছুতেই রাজি হল না।

—ওকে বোঝাতে হবে।

—তুমি বৌদির সাথে বুঝে শুনে কথা বোলো।

—আরে দূর কোনও ব্যাপারই নয়।

মুখে কথাটা বললেও ভিতরে ভিতরে একটা খয়াটে স্রোত কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। কলিগরা সব বোঝে।

সন্দীপ মনে মনে আওড়ায়—ব্যাটা একটা রেপিস্ট। কোন অনুতাপ নেই!

অরুণ দাঁতে দাঁত চেপে—নাবালিকাও ছাড় পায় না! ঘৃণ্য নরকের কীট।

দুই কলিগ চোখ দিয়ে ওকে জরিপ করে নেয়।

ওরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল তাতে তিনজনে উঠে পড়ে ট্যাক্সি দমদম নাগেরবাজারের ফ্লাটের সামনে এসে দাঁড়ায়।

অরুণ বলে—ভাই আমরা চলি। তুমি ভিতরে যাও।

শ্রমণের সাহস হয়না একা একা ফ্লাটে শ্রাবণীর সামনে দাঁড়ানোর। কি করে দাঁড়াবে? বুকের ভিতরে ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা মারছে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়—

—আরে বন্ধু ভিতরে এসো পড়ে যাবে। এলে একটু চা খেয়ে যাবে না! অনেক করেছ আমার জন্য। এসো এসো সন্দীপ, অরুণ প্লিজ বন্ধু চলে এসো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা ফ্ল্যাটের ভিতরে যায়। দরজা ভেজানো ছিল। তিনজন ঘরে ঢুকতেই পাঁচবছরের মেয়েটি ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে—বাপি বাপি তুমি কোথায় ছিলে বাপি? আমি কত কেঁদেছি।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে—আমিও তোমাকে মিস করেছি সোনা। কাজে ছিলাম তো তাই আসতে পারিনি।

—হ্যাঁ মা বলেছে তো ওরা তোমাকে আটকে রেখেছে। তোমাকে আটকে রেখেছিল কেন বাপি ?

—ওরা দুষ্টু লোক তাই সোনা।

—না তুমি দুষ্ট লোক মা বলেছে আমাকে।

—সোনা মা কাকুরা এসেছে। ওদের সাথে কথা বলি। তুমি মায়ের কাছে যাও।

এতক্ষণ পরে শ্রমণের নজর পড়ে ঘরের মধ্যে দুটি ট্রলি ব্যাগ দরজার পাশে রাখা। শ্রাবণীর ভ্যানিটি ব্যাগটাও ট্রলির উপরে রাখা। মেয়ে আর শ্রাবণী দুজনেই রেডি হয়ে রয়েছে বাইরে যাবার জন্য। সব বুঝেও না বোঝার ভান করে বলে—

—শ্রাবণী ওদের জন্য একটু চা করে দাও।

ও কোন কথা বলে না ঠায় বসে থাকে।

—সোনা, প্লিজ শোনো পরে আমরা কথা বলি। আগে ওদের জন্য একটু চা ...

সন্দীপ বলে ওঠে—এখন চা থাক। পরে একদিন হবে। আজ চলি বৌদি।

—ট্রলি এখানে কেন রেখেছ? আমি পরে কথা বলছি। একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। আমি সব মিটিয়ে ফেলব। আমি কোনও অন্যায় করিনি।

শ্রাবণী কোনও কথা বলে না। মেয়ের হাত ধরে ট্রলি নিয়ে এগিয়ে যায়। সন্দীপ অরুণ এই ভয় করছিল।

সন্দীপ ওকে থামাতে যায়—প্লিজ বৌদি আপনি যাবেন না।

অরুণ যোগ দেয়—হ্যাঁ বৌদি একটু ধৈর্য্য ধরুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রমণ মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে—

—এই সব সামান্য ব্যাপারে কেউ রাগ করে! বললাম তো একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। নীলা যে কেন এটা করল বুঝতে পারছি না। কত বছর ধরে আমার কাছে পড়ছে মেয়েটা...

শ্রাবণী হাত ছাড়িয়ে নেয়। মেয়েকে ওর কোল থেকে কেড়ে নিতে গেলে ও বাঁধা দেয়—

শ্রাবণী শোনো প্লিজ এটা কোরো না। সন্দীপ অরুণ প্লিজ ভাই তোমাদের বৌদিকে একটু বোঝাও। এ রকম ছেলেমানুষি কেউ করে? একটা সামান্য ব্যাপার...

সবাই দেখে শ্রাবণী তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। রাগে ক্ষোভে ওর দুটি চোখ জ্বলছে। চোখ থেকে স্ফূলিঙ্গ ঝরছে। বুকের দাবানলটা দাউদাউ করে জ্বলছে। যেন সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে নিমেষে।

শ্রমনের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে—হে ভগবান বন্ধুদের সামনে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দাও।

—শ্রাবণী প্লিজ এরকম করে না।

শ্রাবণীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে যায়। ও ছিটকে সরে যায় সমস্ত শরীর রাগে ঘৃণায় কাঁপছে—

—একদম ছোঁবে না আমায়, একটা লম্পট

—এসব বলে না বললাম তো সব ঠিক করে দেব। এত ভেবো না।

সন্দীপ অরুণ চা না খেয়েই ফিরেছিল। চা খাবার রুচিও ছিল না ওদের। আটকে রাখতে পারেনি শ্রাবণী আর ওর মেয়েকেও। ওরাও ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল বন্ধুরা চলে যাওয়ার পরেই।

সোফায় গা এলিয়ে শ্রমণ অনেক বন্ধুকে ফোন করে জানিয়েছে জেল থেকে ফেরার কথা। অনেককে ধন্যবাদ দিয়েছে ওর পাশে থাকার জন্য। সোফায় বসে টিভির খবরটা চালিয়ে দিয়ে সাউন্ড মিউট করে দেয়। এরপর ভাবতে থাকে হঠাৎ কি হলো নীলার! এরকম করল কেন! আজ তিন বছর ধরে নিয়মিত ওদের সম্পর্ক। অনেকদিন তো এসব হয়েছে। তবে বুঝতে পারছে না নীলা হঠাৎ করে পুলিশের কাছে গেল কি করে! অনেকবারই তো রাগারাগি হয়েছে মিটেও গেছে। সেই ক্লাস টেন থেকে পড়ছে। এবার এইচ এস দেবে। না ওকে বাগে আনতে হবে। একটা সাইকেল চেয়েছিল দেওয়া হয়নি। এখন তো সব জানাজানি হয়ে গেল। আর কেউ পড়তে আসবে? তৃষা মিনু রঞ্জনা দীপিকা নন্দিতা ওরাও কি আর ছুঁতে দেবে? দূর শালা সব ভুল হয়ে গেল। একটু জোরাজুরি করেছিল মাত্র।

শ্রমণ নীচে গ্যারেজে ব্যাচ পড়ায়। এখানে ফ্ল্যাট কেনার পর থেকেই পড়ায়। ছেলের থেকে মেয়েই বেশি, ওদের আধো আধো কথায় খুব খুশি হয় ও। একটু গাল টিপে আদর করে দেয় ওদের। কাউকে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। ওরাও খুশিতে চলকে ওঠে। স্যারের পাশে বসার জন্য হুড়োহুড়ি করে যেন প্রতিযোগিতা লেগে যায়। আসলে এই টিনেজার বয়স শরীর তো বাঁধ মানে না। একটু ছুঁয়ে দিলেই ওদের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে। একদম ঝুঁকে পড়ে পাকুর লতার মত। ধানের শীষের মত দুলতে থাকে। ভাবতে ভাবতেই শরীরে আগুন লেগে যায়। আজ তিন মাস হল অভুক্ত শরীর। শ্রাবণী রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেল! রাগে রি রি করে শরীর। টিভির পর্দায় চোখ যায়। এক সুন্দরী খবর বলে যাচ্ছে। মিউট করা তাই কিছুই শোনা যাচ্ছে না তবে দেখতে ভালই লাগে। চোখের আরাম। মেয়েটি খুব সেক্সি। মনে মনে মিলনটা সেরে নেয়। সম্ভোগ শেষ হলে আবেশে চোখ বুজে আসে।

নীলা কদিন পর এইচ এস দেবে , ওর বাবা ছেড়ে গেছে। মা আবার বিয়ে করে সংসার করছে। নীলা মামা বাড়িতে আশ্রিতা। এ ব্যাপারে ওদেরও অনেক সম্মানহানি হয়েছে। মেয়েটির বিয়ে দিতে পারবে?

শ্রমণের কলিগ অলোক আর সন্দীপ দুজনে নীলার পরিবারের সাথে দেখা করে কথা বলে। ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে অনুরোধ করে । টাকার প্রস্তাবও দেয়। কেস তুলে নেবার কথা বলে। বোঝায় একটা সংসার ভেঙে যাবে। নীলার মামা কিছুতেই রাজি হয় না

—শয়তানের শাস্তি হওয়া দরকার। কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে কে জানে। টিউশনির নাম করে মেয়েদের সম্ভোগ করেছে। নাবালিকা মেয়েরা না বুঝেই ফাঁদে পা দিচ্ছে। ওর যাবজ্জীবন জেল হোক। জেলের গড়াদের অন্ধকারে জীবন কাটুক। তারপর বুঝবে।

প্রায় মাস খানেক কথা চলার পর মা মীমাংসায় রাজি হয়। অনেক কথা চালাচালি হয় অবশেষে পাঁচ দশ শেষে পনেরো লাখে রফা করে মেয়ের মা। টাকা নিয়ে তবে কেস উইথড্রো করবে। এত টাকা! শ্রমণ গাইগুই করে।

—একাউন্টে এত টাকা নেই। মেরে কেটে দশ লাখ হতে পারে। আরও পাঁচ লাখ! কোথায় পাবো? কলিগরা ভরসা যোগায়। সোমা আর ডলি ম্যাডাম এগিয়ে আসে। টাকা দিয়ে সাহায্য করবে কথা দেয়। টাকা দিয়ে হেল্প করে। ওরা আসলে রাজনৈতিক বন্ধু। একই দলের। অন্য রাজনৈতিক দলের লোকরা হাসাহাসি করলেও জোগার হয়ে যায় পাঁচ লাখ টাকা।

নীলার মায়ের হাতে গুণে গুণে পনের লাখ ক্যাশ টাকা দিয়ে কেস খালাস করে।

—নাহ্ কদিন খুব খেটেছ তোমরা। বিপদের দিনে বন্ধু চেনা যায়।

—ভাই তোমাদের এই উপকার কোনদিন ভুলবো না। দিদিরা তোমাদেরও পায়ে শত কোটি প্রণাম। এই বিপদে এভাবে পাশে থেকেছো। শুধু শ্রাবণী বুঝলো না। তোমরা যদি একটু বোঝাও ওকে...

কলিগরা অনেকেই শ্রাবণীর বাপের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে বুঝিয়েছিল

—ফিরে এসো। নিজের সংসার। বাপের বাড়িতে কদিন থাকবে? একটা ছোট্ট মেয়ে রয়েছে তোমাদের। ক্ষমা করে দাও। মেয়েদের অনেক কিছু সহ্য করতে হয়।

শ্রাবণী ফিরে এসেছিল। ছোট্ট মেয়েটার জন্য এই সেক্রিফাইস। তাছাড়া বাপের বাড়িতে একটুও মর্যাদা নেই। স্বামী পকসো কেসের আসামী। ভাইয়ের বউ পাড়া - প্রতিবেশীরা আড়ালে হাসাহাসি করে। বাবা নেই। মায়ের হয়েছে যন্ত্রণা। মেয়েকে যে ডিভোর্স দিতে বলবে তা থাকবে কোথায় খাবেই বা কি ? দাদা ভাই বোন এসবের মধ্যে জড়াতে চায় না। তাদের সম্মান আছে। সব বুঝে মেয়েকে কোলে নিয়ে স্বামীর কলিগদের সাথেই ফিরে আসে কলকাতার ফ্লাটে।

শ্রমণের মা ভাই কেউ খোঁজ নেয়নি। খবরের কাগজে খবরটা দেখে লজ্জায় তারা চুপ করে থাকে। ছোটবেলা থেকেই একই রকম। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়। যেখানে সেখানে মধু খেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

মা বলে ওঠে—ওর পরিবর্তন হলো না। প্রেম করেই বিয়ে করেছিল। বৌমা ভীষণ ভালো মেয়ে। এসব টলারেট করে কিভাবে!

মেয়েটা এখনো ছোট নইলে বড় হয়ে ও যখন শুনবে বাবার কীর্তির কথা তখন কি করবে? ওর সাথে কোনও সম্পর্ক রেখোনা মা। আমাদের সম্মান ধূলিসাৎ।

মাও ভীষণ কড়াঘাতের মানুষ। অসম্মান বরদাস্ত করতে পারে না—ছোটবেলা থেকেই ও এরকম। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে পাট খেতে অসভ্যতামি করে বেড়াতো। এখনো চলছে। ভেবেছিলাম বিয়ের পর ঠিক হয়ে যাবে।

—এসব শোধরানোর নয় মা। মধুমেহ রোগে ধরেছে ওকে।

শ্রমণ আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে সব ঠিক হচ্ছে। যদিও ঘরের অবস্থা এখনো ঠিক হয়নি। শ্রাবণী অন্য বেডরুমে মেয়েকে নিয়ে থাকে। পিছনে দু একজন হাসাহাসি করে। ক্লোজ ফ্রেন্ড রিতু জিজ্ঞেস করেছিল

—কি হয়েছিল? সামলাতে পারলি না কেন?

—আরে নীলু বলেছিল শরীরটা খারাপ। একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে

পড়েছিলাম জোর করেছি এই আর কি।
—তাতে ১৫ লক্ষ টাকা খেয়ে নিল...
—শালা বুঝতেই পারিনি রে। আর ও পুলিশের কাছে চলে গেল! কত কিছু যে দিয়েছি তার ইয়াত্তা নেই। জামা কাপড় এমনকি গয়না পর্যন্ত। ছোটখাটো জিনিস তো বাদ দিলাম। এক নিমেষে সব ভুলে গেল! বেইমান আর কাকে বলে।
—বাদ দে। ওসব আর ভাবিস না। শ্রাবণীর রাগ কমেছে?
—নারে বন্ধু ব্যাপারটা এখনো মেটেনি।
—তাহলে তো সমস্যা হচ্ছে।
—আরে ছাড় না মেয়ে কি কম আছে দুনিয়ায়?—হা হা করে হেসে ওঠে শ্রমণ।
রিতুও হেসে ওঠে—তুই ও পারিস। আর ঠিক হলিনা রে।
—রিতু নতুন যে মেয়েটি জয়েন করেছে। খাসা রে।
—নজর দিস না। ভালো হয়ে যা আর গন্ডগোল করিস না ভাই...
—দূর কিযে বলিস? আজ ল্যাবে প্যাক্টিক্যাল ক্লাস আছে ওর সঙ্গে। ঠিক তুলে নেব। শালী চাঙ্গাস মাল।
অলোক দূর থেকে সব শুনেছে। হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে—ভগ্নিপতি মধুমেহ রোগ চিনি কম...



সকলকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

উত্তম মণ্ডল

বিজেপি নেতা

গোলবাজার, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-

মণ্ডল কন্সট্রাকসান

সুদক্ষ নির্মাণকারী দিয়ে যত্ন সহকারে
সরকারি ও বেসরকারি ভবন নির্মাণ করা হয়।

প্রোঃ- চন্ডী মণ্ডল

অতুলচন্দ্র সরণী (রাজা মার্কেটের পাশের গলি), হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা
মোঃ ৯৩৩৩৭৫০৩৪৪, ৭৬০২৪৬৪০৬৩

ভালবাসার কবিতা

তারাশঙ্কর আচার্য্য

মনের আনাচে কানাচে উঁকি দিচ্ছে
তোমাকে না বলা গোপন কথা,
তুমি জানো না -
কিভাবে একটি কবিতা ঝর্ণা হয়
আর আপন ছন্দে কুল কুল করে বয়ে যায়।
সামনে ভাদ্র - আশ্বিন মাস
পান পাত্র উপচে পড়ছে আবেগে,
আমি অবগাহন করে তৃপ্ত হই
তোমার মোহিনী জাদু মন্ত্রে।
এই স্নিগ্ধ রমনীয় তপাতপ
দুই ধারে সুউচ্চ গিরি কন্দর,
তোমার বুকে অনন্ত ঐশ্বর্য
কবিতা, আমাকে একটু আশ্রয় দিও।

আস্ফালনের ফলাফল

সৌভিক দাস

দুর্নীতি পকেট ভরায়,
প্রতি ক্ষেত্রে সর্বনাশ;
মেরুদণ্ডে জং ধরায়,
থমকে আছে বিকাশ।

যত দাও উপঢৌকন,
ক্ষিপ্ত হয়েছে দেবতা;
সবই নাকি প্রলোভন,
খেলা বুঝেছে জনতা।

ঔদ্ধত্য খুবই চাপের,
মগজে নেই তোমার;
স্বৈরাচার যে পাপের,
রাজত্ব তবে চুরমার।

সত্য ও প্রলাপ

বিপ্লব বড়াল

মানুষের মত দুপেয়ে হয়েছি
মেঠো ইঁদুর হলেই বা কি হত! তাছাড়া মেঠো ইঁদুর থেকেই দু পা হল কিনা কে জানে। আমার ভিতর থেকে মানব স্বভাব অন্তর্ধান করেছে। এখন আমি জানি না আমার পরবর্তী আয়োজন কি হবে? কিছু মাত্র আগে আমি জন্ম মৃত্যু ভেদ করে এসেছি এখন আমার সত্য ও প্রলাপ কবিতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এক পৃথিবী অধৈর্যে আমার গা, মাথা টলছে।
এখন জগতের সমস্ত হাসপাতালই আমার জন্য চিকিৎসা বিহীন।

আমি ঐতিহাসিক

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ঐতিহাসিক
আমি যা বলি তা কখনোই করিনা
আমি যা কখনও বলিনা তাই করি
আমি যখন ভয় পাই
তখন আমি সীমাহীন দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করি

আমি যখন ভালোবাসার বার্তা দিই
ভিতরে ভিতরে আমার শঠতা গলিত লাভা হয়ে বয়
আমি যখন অঙ্গীকারবদ্ধ হই
তখন সেটা ভাওতার চূড়ান্ত রূপ।

আমি ঐতিহাসিক
আমার ভিতরে যখন প্রেমের বিগলিত স্রোত
বইতে শুরু করে
তখন সেটা প্রতারণার নির্মম ফাঁদ

আমি নীতি নৈতিকতার ধার ধারিনা
কিন্তু সে বিষয়ে উপদেশ দিতে
ব্যস্ত আমি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ মানিনা
অন্য সকলকে বামনের মতো দেখি
শালীনতা-অশালীনতা আমার পদতলে
পোষা কুকুরের মত গড়াগড়ি দেয়

আমি উদ্ধত আমি বেলাগাম
আমি নিজেকে ছাড়া কাউকে করিনা কুর্নিশ
আমি ঐতিহাসিক।

আমি যখন ঘৃণা ভাষণ দিই
তখন তাতে থাকেনা কোনো খাদ
আমি যখন অসত্য তথ্য প্রকাশ করি
তখন তাতে সত্যের মাখন প্রলেপ দিই
আমি কখনও পরাজয় স্বীকার করিনা
আমি পরাজিত হলেও আমি জয়ী
আমি ঐতিহাসিক।

আমাকে যাঁরা অনুসরণ করে তারা আমার অন্ধভক্ত
আমি তাদের চোখে অজ্ঞানতার ঠুলি এঁটে দিই
আমার থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে
তারা শুধু আমার শিক্ষার গন্ডিতেই আবদ্ধ
তবুও আমি মহান সেবক
প্রধান সেবক লৌহ পুরুষ
আমি ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত
আমি ঐতিহাসিক।

মহান বর্তমান

সুদিন গোলদার

শিক্ষা যত চুলোয় গেছে
স্বাস্থ্য তথৈবচ,
সংস্কৃতি গেছে ডুবে
শান্তি তছনছও।
কেলেঙ্কারি বিশ্বজুড়ে
ঘুষের কারবারি,
মহান অনেক মন্ত্রী নেতা
দুর্নীতির ধাড়ি।
বিশ্বাসটা গেছে মরে
সৎ কবেই গুম,
সন্ত্রাস আর রাহাজানির
এখন মহা ধুম।
দেখবেন না কোন কিছু
কানে লাগান তালা,
জোরে জোরে বগল বাজান
বলছে নেতার চ্যালা।

বর্ণমালা

অরুণকুমার মান্না

মাত্র কয়েকটি বর্ণ সংঘবদ্ধভাবে নতুন সুর আনে,
ছন্দ আসে, একে অপরকে চেনায় ভাষার প্রলেপে,
কত স্তব্ধতা জনপদ পেরিয়ে অন্ধকারে আবছা দৃশ্যে!
যারা কাঁদে, তাদের স্বরও কয়েকটি বর্ণের মহাবৃত্তে।

নিঃসঙ্গ দুপুর কিংবা চির হতাশায় হেলে পড়া বিকেল
যখন বাঁচার উপমা খুঁজতে ব্যস্ত পশ্চিমের জীর্ণ মাঠে
অথবা প্রবল বৃষ্টির হড়পায় ভেসে যাওয়া শেষ সম্বল,
তখন ওই বর্ণমালাই খোঁজে কঠিন প্রত্যয়ের অঙ্গীকার।

হাতে হাত রাখার লাজুক মুহূর্তের সাক্ষী সে তো তারাই মিষ্টি বর্ণের
সমাহার ডেকে আনে ভাবী স্বপ্নের সংকেত,
পায়ে পায়ে পথ চলার আনন্দেও মেশে বর্ণের আশ্বাস
ঠোঁটের হাসিতে অদ্ভুত ভাবে ছড়িয়ে তাদেরই পূর্বাভাস।

ধ্যানমগ্ন ঋষি, আমৃত্যু স্থির, স্নায়ু শিরা ধমনী ক্লান্ত,
তারাও ওম শব্দের লালিত্যে অতি মগ্ন অনাদিকাল।
যাবতীয় বাসনা রঙিন আবিরে বসন্তের আঙিনায়-
প্রিয় বর্ণমালা, ব্রহ্ম ছুঁয়ে থাকো বাঁচার মুখ্য আবেদনে।

গ্রেপ্তার

সুশান্ত সেন

দেখুন মশাই আমি ত গ্রেপ্তার করতে এসেছি
গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব,
তারপর আপনি জানেন -
নদীর জল বইতে থাকবে বইতেই থাকবে।
আপনি সাঁতার জানেন?
জানলে হাবুডুবু খাবেন হাবুডুবু খাবার মজা
হাড়ে হাড়ে বুঝবেন।
আর সাঁতার না জানা থাকলে ডুবে মরবেন।

জানেন কি
ছ বছর পরে জামিন পেলো রাঘব বোয়াল,
আর আপনি ত চুনোপুটি,
কই মাছের প্রাণ নিয়ে ঘর্ষণ করে চলেছেন।

কি দরকার ছিল আপনার
সাতে পাঁচে জড়াবার?
বেশ ত ঘানি টানছিলেন স্ত্রী পুত্র কন্যা নাতি নাতনী সহযোগে।

যাক এখন গাড়িতে উঠুন।
নির্দেশ অমান্য করা যাবে না।

ঝড়ের প্রকৃতি

অষ্টপদ মালিক

তখন যে ঝড় উঠেছিল
এখন পুরোপুরি থেমে গেছে
স্তব্ধ আমি আর আমার চারপাশ ।

গোধূলি বেলায়
কত পথিক আর কত পাখি
সবাই পথ হেঁটেছিল
তারা প্রত্যেকে ঝড়ের মুখে পড়েছিল
না জানি তারা সবাই ঘরে ফিরেছে কিনা

কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব
সবুজ সতেজ প্রাণগুলোকে
 তছনছ করে দিল
ওরা আগেভাগে কেন যে সাবধান হলো না !

চিন্তা

চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দোরগোড়ায়—কে যেন দাঁড়িয়ে আছে—
জিজ্ঞাসা করলাম—কি দরকার
তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য
কেন?
আমার জীবনের দীর্ঘ সংগ্রাম
বোট প্রান্তে
একটু সময় দাও
আমার ত্রি-আশি বছরের সঞ্চিত সম্বল,
ওদের জন্য খুব চিন্তা—
কার হাতে তুলে দেবো
ওদের সু-ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না
ওদের কি হবে—কে দেখবে?
আজীবন ব্যাগ ভর্ত্তি করে নিয়ে এসেছি
সাজিয়ে রেখেছি বই-এর আলমারিতে
ওদের দেখভাল কে করবে
আমার শরীর মন ভেঙ্গে পড়েছে
যাদের আপন করে অন্তরে ঠাঁই দিয়েছি
তারাই আঘাত হানে বার বার
ঔষধ আর করুণায়
মনের ব্যথা নিয়ে রয়েছি
আমার সঞ্চিত সম্পদগুলি
কে আমার মতো করে দেখবে?
আমরা দু'জনই অন্তিম পথের যাত্রী
আঠারো মাস—আমার ঘুম নেই
হারিয়ে গেছে কোন অজানার পথে
ঘুম নেই—ছটফট করি বিছানায় শুয়ে
আমি ধর্মপ্রাণ মানুষ
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি
আমি থাকতে থাকতে
ওকে তোমার চরণতলে আশ্রয় দাও।
দেখে যেতে পারি
ও শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে তোমার পদতলে।

যুগ-বাহক

সঞ্জীবন রায়

এক একটি যুগ, লিখে রাখে এক অনুক্ত সময়।
কথা বলে, এক অজানা জীবন প্রবাহের।
যাপনের নিস্তরঙ্গ দীঘিতে ঢেউ ওঠে,
স্মৃতি -পত্র ঝরে পড়ে পরিশ্রান্ত পরিযায়ী যাত্রাপথে,
হারিয়েও যায় চিরতরে।

যে মানুষেরা, যাদুকরী কাহিনী শুনে পাড়ি দিয়েছিল বিশ্বায়িত শহরে, ফিরে আসতে চায় নিজের ভূমিতে , ফেলে রেখে যাওয়া ভগ্নপ্রায় গৃহে।
যে মানুষেরা বলেছিল , গুরুগম্ভীর তত্ত্ব কথা অনেক , দিন গুনছে তারা বিস্মৃতির আড়ালে। অনুগামী
যারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় , মুঠিতে শূন্যতা ধরে আছে।
যে মানুষেরা শিখিয়েছিল, অল্পেই সুখ, বৃত্তের বাইরে বসে , ভাষাহীন মুখে দেখছে : কি ভাবে মুছে যেতে থাকে , অকিঞ্চিত আনন্দের শেষ বিভা।

এক একটি যুগ , এক একটি বহ্নিমান জীবন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে আছে।কোলাহল থেমে যাওয়া, তারা ভরা রাতে জেগে থাকে যুগপুরুষ একা, একান্তে লিখে চলে রাত্রিদিন
প্রজন্মের উদ্দেশ্যে , নির্মোহ অনুভবগুলি।
ছুটে আসে, স্বার্থহীন ভালোবাসা নিয়ে
যুগ- ধনী মানুষটিও, করতলে উষ্ণতার স্পর্শ রেখে বলে, দূরে হারিয়ে যেও না।

দিমাগী নকশাল

অভিজিৎ দাশ

স্ক্রিন তোমার,
তুমি চিৎকারে - চোখ রাঙিয়ে,
নরম ন্যাকামো মাখিয়ে
সব মিথ্যেকে
তোমার বিষাক্ত লালায় - উৎসেচক মিশিয়ে,
স্ক্রিন ফাটিয়ে - বেরিয়ে আসো,
রোজ - প্রতিমুহূর্তে।
ভেবেছো সহজে, পৌঁছেবে মগজে।

তোমার শাখানিকেতনে
হাফপ্যান্ট পরা চিটার, টিচারি করে।
ভীড় তৈরী করে - খুন করার,
(প্রেম - স্বপ্ন - বর্ণময়ছবি) প্রশিক্ষণ চলে
রোজ - প্রতিমুহূর্তে।
ভেবেছো সহজে, পৌঁছে যাবে মগজে।

রঙিন চাদরে ঢাকতে চেয়েছো
ভাঙাঘর - বিবর্ণমুখ - ক্ষিদে।
তোমার লাম্পট্যে
ধর্ষকামী উন্মাদ তৈরী হয়,
তোমার লকলকে জিভ
জল - জঙ্গল - পাহাড়,
সব কিছু চেটে খেতে পারে।
কিন্তু নীল আকাশের সাদা মেঘের রং
পাল্টাতে পারবে?
চাদর ঢেকে , মগজ ঢাকতে পারবে?

মারণ রোগের জীবাণু,
হাওয়ায় উড়িয়েছো --অবসাদগ্রস্ত দুপুরে
রক্তে মিশিয়েছো।
কলকারখানায় - স্কুলে - ভীড় ট্রেনে,
ধর্মস্থানে- রান্নাঘরে, এমনকি ক্লান্ত শরীরের
রাতের বিছানায়।
এবার রাস্তায় তৈরি ‘প্রতিষেধক’ প্রস্তুত হচ্ছে।
ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির
জেগে ওঠা চোখ আর আগুনের বিচ্ছুরণ,
নিশ্চিত তোমার তাসের ঘরে
আগুন জ্বালাবে।

দিমাগী নকশাল সমস্ত আকাশজুড়ে।

অমৃত-অন্বেষণ

টুম্পা মুখার্জী

তুমি কি জানো, দেবতারাও একদিন
সমুদ্র মন্থন করেছিল শুধু তোমার জন্য ;
সেই যে বিষ উঠেছিল প্রথমে,
তা আমি গলায় ধরেছি হাসিমুখে,
নীলকণ্ঠ হয়েছি তোমার প্রেমে।
মন্দার পর্বত ছিল আমার জেদ,
বাসুকি সাপ ছিল আমার দীর্ঘশ্বাস,
আর দেবতা-অসুর মিলিয়ে যত শক্তি ;
সবটুকু ঢেলে দিয়েছি শুধু এই আশায়,
যদি উঠে আসো তুমি।
কত কী উঠেছে মন্থনে ;
ঐরাবত, কামধেনু, পারিজাত,
লক্ষ্মী এসেছেন পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে,
কিন্তু আমি তাকাইনি,
আমি শুধু খুঁজেছি অমৃত।
তুমিই তো সেই অমৃত ;
যা পেলে মৃত্যু থাকে না,
যা না পেলে বেঁচে থাকাও মৃত্যু।
ধন্বন্তরি যখন কলস হাতে উঠে এলেন,
দেবতারা ছুটলেন লুফে নিতে,
আমি তখনও সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভাবছি
তুমি এখনো আছো সেখানে,
অতলের ভেতর,
আলোর মতো ছড়িয়ে।
অমৃত পেলে অমর হওয়া যায়,
কিন্তু তোমাকে না পেলে
অমরত্ব শুধু একটা দীর্ঘ অভিশাপ।
তাই আমি সমুদ্র মন্থন করে চলেছি
জন্মজন্মান্তর; বিষ গিলে,
পর্বত বহন করে,
দেবতা ও অসুর দুই দিকে টানতে টানতে।
কারণ তুমি উঠে আসবে একদিন,
অমৃতের চেয়েও মধুর হয়ে,
আমার হাতের কাছে।
আর সেদিন আমি অমর হবো না,
শুধু সম্পূর্ণ হবো।

কর্তৃত্ববাদী ভারত রাষ্ট্র

নোটন কর

কর্তৃত্ববাদ কথাটা ইংরেজি 'Authoritarianism' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। কর্তৃত্ববাদ হল স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের এক মিশেল রূপ, যেখানে নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মতামতের কোনো মূল্য দেওয়া হয়না। কর্তৃত্ববাদী শাসকরা ফ্যাসিবাদকে বৈধ করে তুলতে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, গণতন্ত্রের আগে বা পরে সুবিধামতো শব্দও অনেক সময় জুড়ে দেয়। কর্তৃত্ববাদী শাসনে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হারিয়ে যায়। সরকারের ঘোষিত ও অঘোষিত নিয়ন্ত্রণের ফলে নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অধিকার বিপন্ন হয়। ভীতি সঞ্চার ও বল প্রয়োগ করে বিরোধী মতকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় এবং গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সব বিষয়ের ওপর শাসকের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রশাসন ও পুলিশের ওপর সরকারের অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং বিচারহীনতা দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকার করে তোলা হয়। নানা পন্থায় কর্তৃত্ববাদী শাসক সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। হয়ে ওঠে ক্ষমতার মালিক, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। প্রসঙ্গত বলা যায়, ফরাসি সম্রাট যোড়শ লুই সদম্ভে ঘোষণা করেছিল, 'আমিই রাষ্ট্র'।

যখন একটি রাষ্ট্র ক্রমশঃ কর্তৃত্ববাদী চরিত্র ধারণ করতে শুরু করে, তখন তার প্রথম আঘাত নেমে আসে মানুষের চিন্তা, বাকস্বাধীনতা এবং ভিন্নমতের উপর। গণতন্ত্রের কাঠামো কিছুটা অক্ষুণ্ণ রেখেও শাসকশ্রেণি ধীরে ধীরে এমন এক রাজনৈতিক পরিবেশ নির্মাণ করে, যেখানে প্রতিবাদকে অপরাধ, সমালোচনাকে ষড়যন্ত্র এবং ভিন্নমতকে রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি, বিশেষকরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ ও কেন্দ্রীয় সরকারে শক্ত অবস্থানের কারণে বিজেপির শাসনামলকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই ধারার প্রধান লক্ষণগুলো হল (ক) সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ:- ধর্মীয় পরিচিতিকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকাশ, যা সংখ্যালঘুদের প্রান্তিককরণের দিকে ঠেলে দেয়। (খ) প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা খর্ব:-বিচার বিভাগ, তদন্তকারী সংস্থা এবং সংবাদমাধ্যমের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি। (গ) ভিন্নমত দমন:-রাষ্ট্রদ্রোহ আইন বা কঠোর নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ করে মানবাধিকার কর্মী, বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাংবাদিকদের বন্দি করা। (ঘ) ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ:- যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর (federalism) অবমূল্যায়ন এবং এককেন্দ্রিক ক্ষমতার চর্চা। (ঙ) কর্পোরেট তোষণ:- রাষ্ট্রীয় নীতি ও ক্ষমতার সাথে বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির ঘনিষ্ঠতা, যা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে তীব্র করে।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সরকারের মধ্যে আমরা উক্ত বিপজ্জনক প্রবণতার লক্ষণগুলো প্রত্যক্ষ করছি। সরকারের কার্যকলাপ বা রাষ্ট্র পরিচালনার সমালোচনা করলেই বিরোধী কণ্ঠস্বরকে 'দেশবিরোধী', 'রাষ্ট্রদ্রোহী' কিংবা 'জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী এবং গভীরভাবে উদ্বেগজনক ও কর্তৃত্বমূলক ফ্যাসিবাদের লক্ষণ।

বিজেপি-আরএসএস নিজেদের মতাদর্শগত ধারণা অনুযায়ী জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রচার চালায়। এসমস্ত ধারনাগুলি তারা মুসোলিনি, হিটলার ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে পেয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন ও শোষণ চালাতে বিভাজনের রাজনীতি কায়েম করেছিল। স্বাধীনতার সময় ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের মধ্যে দিয়ে তাকেই কার্যকরী করতে সক্ষম হয়। দেশভাগ কেবল এই ভূখণ্ডের বিভাজন ছিল না; এটি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক একটি চক্রান্ত যেখানে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছিল শ্রেণি-ঐক্য ধ্বংসের জন্য আর নতুন ধরনের শোষণের ভিত গড়ে তোলার জন্য। ভারত তথা বাংলা ভাগের প্রধান কারিগর ও উদ্যোক্তা ছিল হিন্দু মহাসভা। ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, আন্তর্জাতিক পুঁজি এবং দেশীয় মুৎসুদ্দী বড় বণিকশ্রেণি। হিন্দু মহাসভার হিন্দু রাষ্ট্রের প্রচার মুসলিম লীগের পৃথক রাষ্ট্র দাবিকে আরও জোরালো করেছে। এই দ্বৈত সাম্প্রদায়িকতায় সবচেয়ে বেশি সুবিধা লাভ করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। যে হিন্দু মহাসভা কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষদিন পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সহযোগিতা করেছে, দেশের প্রত্যেকটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় প্রতিটি অধ্যায়ের সরাসরি বিরোধিতা করেছে, জন্মলগ্ন থেকেই দেশের মানুষকে সুচতুরভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ বিষে জর্জরিত করেছে, জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত অবমাননা করেছে, আজ তারাই সহসা দেশপ্রেমের ঠিকাদারি নিতে চাইছে একচেটিয়াভাবে! বিজেপির বর্তমান কাঠামো একক ও শক্তিশালী নেতৃত্বের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। দলের নীতিনির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি মূলত কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত, যা দলের মধ্যে শীর্ষ নেতার প্রতি আনুগত্যকে সুদৃঢ় করে এবং স্থানীয় বা ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ সীমিত করে।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি শুরু থেকে ছিল না। জরুরী অবস্থা জারী করার সময় ঐ কথাটি সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে তাকে বাতিল করা হয়নি। আমাদের সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সমানাধিকারের উল্লেখ রয়েছে। আজকের ভারতে সেই অধিকারটিই বিলোপ করার চেষ্টা চলছে। বিজেপি সংঘ পরিবারের মাধ্যমে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং এক দেশ এক ভোট ও এক দল গড়ার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ইতিহাস বলে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগায়। আজকের ভারত রাষ্ট্র, বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন না করে ধর্মের বিকৃত নির্মাণ করে

সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতাকে মদত যুগিয়ে, নিজেই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিভু হয়ে ওঠেছে।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ক্রমাগত দুর্বল করে চলেছে। সরকার রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রীয় নীতির নিছক বাস্তবায়নকারীতে পরিণত করে তাদের স্বায়ত্তশাসনকে ভীষণভাবে খর্ব করে চলেছে। আন্তর্জাতিক ও দেশিয় কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থের পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা দ্বারা পরিচালিত এই প্রক্রিয়া দেশের সাংবিধানিক নীতিগুলোর ক্ষয়কে আরও ত্বরান্বিত করেছে। যদি এভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পিত ভাঙন চলতে থাকে, তবে ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডকে রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর হুমকির মুখে ফেলবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের চেতনা গড়ে তোলে, এইভাবে অভিন্ন জাতীয় পরিচয় ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হয়। সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। বিজেপি সাংবিধানিক এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙ্গে 'শক্তিশালী কেন্দ্র' বা কর্তৃত্ববাদ বেছে নিচ্ছে।

লোকসভায় বিজেপি'র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা এ দেশের রাজনীতিতে বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির আধিপত্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বল্গাহীন কর্পোরেট স্বার্থবাহী নীতি প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা চলছে গোটা দেশজুড়ে। গরিব কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া, পুঁজিপতিদের বিরাট অংকের কর ছাড়, পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় আইনকে নস্যাৎ করে কর্পোরেটদের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে দেওয়া, শিক্ষা/স্বাস্থ্য খাতে ব্যায়বরাদ্দ সংকোচন, প্রতিরক্ষা খাতে বিদেশী বিনিয়োগ, আর্থিক পরিষেবা, নির্মাণশিল্পে বিদেশী বিনিযোগ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একচেটিয়া পুঁজির প্রবেশ ত্বরান্বিত করা হয়েছে। বিজেপি সরকারের আমলে বিরাষ্ট্রীয়করণের বিপুল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অভূতপূর্ব কর্পোরেটদের সাহায্য পায়। বস্তুত, বিজেপি সরকারের সময়কালে সর্বোচ্চ বিত্তশালী ১ শতাংশের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ৪৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৮ শতাংশেরও বেশি হয়ে গেছে। হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক শক্তি ও কর্পোরেটের পারস্পরিক সম্পর্ক ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে গুরুতর এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপদ। একদিকে বড় পুঁজিকে যাবতীয় সমর্থন যোগানো এবং উন্নয়নের একমাত্র রাস্তা হিসাবে তাকে প্রতিপন্ন করা, অন্যদিকে বিরুদ্ধমত, গণতান্ত্রিক যাবতীয় ব্যবস্থার কণ্ঠরোধ করার এবং কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার যৌথ অভিযানে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আরএসএস-এর লক্ষ্য হল ভারতের বহুত্ববাদী কাঠামোকে ভেঙ্গে একটি এককেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আরএসএসের দর্শনে বিজেপির ভারত শাসন এক ফ্যাসিস্ট বা কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। পুঁজিপতিশ্রেণিও ভারতের পুঁজির শাসন থেকে যে ফল চায় তার জন্য দেশে একটি ফ্যাসিস্ট শক্তির বৃদ্ধি জরুরী বলে মনে করছে।

গত জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অপরাধ দমন এবং জননিরাপত্তা রক্ষার নামে একটি কর্তৃত্ববাদী আইন 'পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৬' চালু করেছে। সরকার বলছে, 'সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও দাগি অপরাধী'দের মোকাবিলার জন্যই নাকি এই আইন করা হয়েছে। আসলে আইনটি, অপরাধ দমনের আইন নয়, বরং শাসকের হাতে নাগরিকের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার অপরিসীম ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই আইনের বলে নেহাতই সন্দেহের বশে যে কোনও ব্যক্তিকে আটক করতে পারবে পুলিশ। কোন সূত্রের বা তথ্যের ভিত্তিতে আটক করা হয়েছে, তা জানাতে পুলিশ বাধ্য নয়। আটক রাখা যাবে এক বছর। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক যে কোন জায়গায় তল্লাশি চালাতে পারবেন। আটক ব্যক্তি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবেন না। ওই আইনে আটক ব্যক্তির শুনানি হবে একটি অ্যাডভাইজারি বোর্ডে। সেই বোর্ডে অভিযুক্ত তাঁর পক্ষে সওয়াল করার জন্য কোনও আইনজীবী কিংবা প্রতিনিধি রাখতে পারবেন না। আমাদের দেশের আইনে, প্রধান নীতি হলো আগে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার, তারপর বিচার, তারপর শাস্তি। এখানে সেই মৌলিক নীতি মানা হচ্ছে না। এই আইনের মাধ্যমে সরকারের আসল লক্ষ্য হল বিকাশমান গণ-আন্দোলন ধ্বংস করা, সরকার বিরোধী আন্দোলন দমন করা ও আন্দোলনকারীদের জেলে পোরা। যেভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলি সহ কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর জন্য 'আস্পফা' আইন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। বিচার বহির্ভূতভাবে অভিযুক্তকে এনকাউন্টারে হত্যা করা হচ্ছে। এগুলো সবই হচ্ছে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র হয়ে ওঠার নমুনা।

রাষ্ট্র ক্রমেই কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠছে, সব ক্ষেত্রেই করছে অনধিকার হস্তক্ষেপ। নাগরিকত্বের শর্তাবলী থেকে শুরু করে প্রজাতন্ত্রের ধরণ বিজেপি ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মূল বুনিয়াদকেই ধ্বংস করতে চাইছে। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হল, রাষ্ট্র এখন মানুষের পরিচয় কেড়ে নেওয়ার অধিকার নিজের হাতে তুলতে চাইছে। এসআইআর-এর মাধ্যমে নাগরিককে নিজেকে ভারতীয় প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ নাগরিক আর রাষ্ট্রের মালিক নয়; রাষ্ট্রই নাগরিকের অস্তিত্বের বিচারক। এই প্রবণতা কেবল সংখ্যালঘুদের জন্য নয়, গরিব হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্যই বিপজ্জনক। কারণ ইতিহাস সাক্ষী, যখন রাষ্ট্র দমনযন্ত্র হয়ে ওঠে, তখন প্রথম আঘাত পড়ে প্রান্তিক মানুষের উপরেই।

আজ ভারতে ভয়াবহ বেকারত্ব, শ্রমিক অধিকার হরণ, কর্পোরেট লুট, কৃষক আত্মহত্যা এসব জ্বলন্ত প্রশ্ন আড়াল করতে ধর্মীয় মেরুকরণকে ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষকে রুটি-রুজির প্রশ্ন থেকে সরিয়ে মন্দির-মসজিদের যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সাভারকরের উত্তরাধিকাররা আজ কর্পোরেট পুঁজি ও সংখ্যাগুরুবাদী রাষ্ট্রের আদর্শিক হাতিয়ার নিয়ে কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে।

ফ্যাসিবাদ কেবল একটি দমনমূলক ব্যবস্থা নয়; এটি এমন একটি রাজনৈতিক প্রকল্প, যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে, সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রের আদর্শে পরিণত করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সন্দেহ ও ঘৃণার লক্ষ্যবস্তু বানায় সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং গণ

আন্দোলন দমন করে, প্রশাসনিক ক্ষমতাকে বিচার ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠা করে; এই প্রবণতাগুলো আধুনিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভারতকে 'অটোক্রেটিক' বা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান 'প্রটেক্ট ডেমোক্রেসি'। ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক থেকে পাঁচ-এই স্কেলে ভারতের অবস্থান ৩ দশমিক ৫, যা ভারতকে 'গুরুতর কর্তৃত্ববাদী' ঝুঁকির তালিকায় উঠে আসা দেশগুলোর মধ্যে রেখেছে। কর্তৃত্ববাদী হওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুত দেশের তালিকার মধ্যে ভারতের সূচক সর্বোচ্চ। গণতন্ত্রের 'গুরুতর' হুমকিকে যেভাবে প্রজেক্ট ডেমোক্রেসি সংজ্ঞায়িত করেছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভারতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাম্প্রতিককালে প্রবল ক্ষয় হয়েছে। এই সংজ্ঞা ভবিষ্যতে ভারতে আরও বড় ধরনের বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভারতকে যদি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে এই হিন্দুত্ববাদী, কর্তৃত্ববাদী, পুঁজিবাদী ও ফ্যাসিবাদী আঁতাতের বিরুদ্ধে শ্রেণি সচেতন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প নেই। ইতিহাস সাক্ষী, যে-সমাজে কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদ জয়ী হয়েছে, সে-সমাজ ধ্বংসের মুখে পড়েছে। অতএব, প্রতিরোধ এখন সময়ের দাবি। ফ্যাসিবাদকে ভোটের অঙ্কে হারানো কঠিন, যদি রাস্তায় মানুষের শক্তি সংগঠিত না হয়। তাই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সবাইকে নিয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কর্তৃত্ববাদী এবং ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্রতর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

লেখক গণ আন্দোলনের কর্মী।



শারদীয়া ও দীপাবলির প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সকলে ভালো থাকুন, ভালোভাবে উৎসব উপভোগ করুন।

তারকেশ্বর হাওলাদার

সভাপতি, ১০১ অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্র, বহুজন সমাজ পার্টি

শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-

কাঞ্চন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

হাটথুবা, যশোর রোড, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

মোবাইল : 9002952915 (আশিস মজুমদার)



গ্রীল, রোলিং সাটার, কাঁচের জানালা, এ্যালুমিনিয়াম স্লাইডিং উইন্ডো, বাড়ির ছাদের বা গোডাউনের উপরের টিন শেড-এর কাজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

ভারতীয় অর্থনীতি : অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না

সৈকত মিস্ত্রী

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন—'যারা ভারতীয় অর্থনীতির বুদ্ধি দেখতে পান না, তারা অন্ধ।'—মুশকিল হল নিন্দুকেরা অন্ধ হতে পারেন, সরকার চক্ষুষ্মান হলেও প্রলয়কে বন্ধ রাখা যায় না। মন্ত্রীমশাইয়ের বক্তব্যের পরপরই ২৮ সেপ্টেম্বর শেয়ার বাজার থেকে ইনভেস্টরদের এসেট কমেছে ৮ লক্ষ কোটি। তথ্য অনুযায়ী নিফটিতে যারা ১ বছর আগে ১ কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছিল তারা রিটার্ন পাবে ৮৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১১ শতাংশ নেগেটিভ রিটার্ন। যে কারণে ভারতের বাজার থেকে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ৫৫ বিলিয়ন ডলার বা ৫৩৭, ২০২ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। ভারতীয় শেয়ার বাজার থেকে ৩০ লাখ রিটেল ইনভেস্টররা মুখ ফিরিয়েছেন। এমন লক্ষণ কি আদৌও বৃদ্ধির পরিচায়ক? নাকি বৃদ্ধির নিম্নমুখীতাকেই ইঙ্গিত দেয়? বাস্তবতা বলছে এ কিন্তু প্রলয়ের উপস্থিতিকে স্পষ্ট করছে।

কিসের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বললেন—অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কথা? একটু পরিসংখ্যানের দিকে নজর দেওয়া যাক—২০২৬-২৭ এর কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রথম ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) এর পেশ করা হিসেব অনুযায়ী জিডিপি বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ৭.৮ শতাংশ। ডাকঘরের এই তথ্য নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় অর্থসচিব সুভাষচন্দ্র গর্গ যে তথ্যটি তুলে ধরেছেন—তার এক অভিঘাতেই কেন্দ্রের জিডিপির হিসাব উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র গর্গের তথ্য দেখাচ্ছে, ২০২৬-২৭ এর ত্রৈমাসিক জিডিপি ২.৬ শতাংশ। তথ্যের এই বিপুল হেরফের কেন? এর উত্তর খুঁজতে আমদের আর একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পূর্ববর্তী বছরের (২০২৫-২৬) প্রথম ত্রৈমাসিকের মূল জিডিপির ভিত্তি বা অঙ্কটা সংশোধন করে কমিয়ে দেখানো হয়েছে। সেই হিসেবটা কেমন এবার সেটা দেখা যাক। ২০২৫-২৬ এর প্রথম ত্রৈমাসিক জিডিপির পরিমাণ ছিল ৮৬.১ লক্ষ কোটি। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান এমনটাই দাবি করেছে। কিন্তু মজার বিষয় এই বছর ৩১ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার পরিসংখ্যান দিয়েছেন ২০২৫-২৬ এর প্রথম ত্রৈমাসিকে। জিডিপি ছিল নাকি ৮০ লক্ষ কোটি। অর্থাৎ সরকার গত বছর জিডিপির যে হিসেব দিয়েছিল বাস্তবে জিডিপি তার থেকে ৬.১ লক্ষ কোটি টাকা কম। ফলে গত বছর জিডিপির প্রকৃত হিসাব পেশ করা হলে, এবছর প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি দাঁড়াবে ২.৬ শতাংশ।

এবার প্রশ্ন জিডিপি হিসেবের ক্ষেত্রে ২০২৫-২৬ এর অর্থবর্ষকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? এর কারণ কেন্দ্রীয় সরকার হিসেবের ভিত্তিবর্ষ ২০১২-১৩ এর পরিবর্তে ২০২২-২৩ এ ভিত্তিবর্ষ ধরেছেন। আর ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ থেকে জিডিপি গণনা পদ্ধতিতে সংশোধন এনেছেন। কিন্তু গণনা পদ্ধতিটি ঠিক কেমন তার কোন স্পষ্ট রূপরেখা সরকার প্রকাশ করেননি—এই অস্বচ্ছতা থেকেই প্রশ্ন উঠছে।

এই অর্থবর্ষেই বিশ্ব জুড়ে কতগুলো অস্থিরতা দেখা গেছে। ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধ, ইরান-আমেরিকা সংঘাত, বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি, ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামের পতন ইত্যাদির মধ্যেও যদি ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি ঘটত—তাতো বড়ো গর্বের, সুখের কথা ছিল। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটলে তো বিনিয়োগকারীরা এদেশকেই বিনিয়োগের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে মনে করতেন। প্রচুর বিনিয়োগ ঘটত। অথচ বাস্তবতা বলছে, যত বিদেশী লগ্নি এসেছে তার অনুপাতে বড়ো অংশ বাইরে চলে যাচ্ছে। শেয়ার বাজার থেকে ৩০ লক্ষ রিটেল ইনভেস্টর মুখ ফিরিয়েছেন। তাহলে সরকারের দাবি, ঘোষণার সাথে বাস্তবতার একটা অসেতুসম্ভব দূরত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বৈপরীত্য দৃশ্যমান হওয়ার পরও কি বলা যায় সকলেই অন্ধ, আর মাননীয় মন্ত্রীমশাই বা তাদের অনুসারীরাই চক্ষুষ্মান?

বর্তমানে মাথাপিছু আয় ও বৈষম্যের নিরিখে ভারত ১৫০টি দেশের নীচে অবস্থান করছে। নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতার নিরিখেও ভারতের অবস্থান ১২৫টি দেশের পিছনে। ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচকের নিরিখে মূল্যবৃদ্ধির হার ৪.৮২ শতাংশ। জুলাই মাসে এই হার ছিল ৪.৪৪ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মূল্যবৃদ্ধির সহনসীমা ৪ শতাংশে বেধে দিয়েছিল। অথচ বর্তমানে ভারতীয় মূল্যবৃদ্ধি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহনসীমাকে ছাপিয়ে গেছে। সুতরাং তথ্যগত কারচুপি করে সরকার জিডিপিকে যতই উঁচুতে দেখাতে চেষ্টা করুন না কেন, বর্তমানে দেশের অর্থনীতি সঙ্কটজনক জায়গায় দাঁড়ানো।

কেন্দ্রের উপদেষ্টা ভি নাগেশ্বর একটি সভায় বলে ফেলেছিলেন—'ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি প্রকৃত অর্থে দেশের অর্থনীতিকে তখনই বদলে দেবে, যখন শ্রমদাতা এবং পুঁজির মধ্যে উৎপাদনের মুনাফা ন্যায্য ভাবে বণ্টন করা হবে।'

কিছুদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও নোবেলজয়ী জোসেফ স্টিগলিটজ এর নেতৃত্বাধীন কমিটির একটি রিপোর্ট থেকে দেখতে পাচ্ছি—ভারতে সবথেকে ধনী ১ শতাংশ মানুষের সম্পদ ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনে এই বৈষম্য বৃদ্ধি ৫৪ শতাংশ। সুতরাং বর্তমানে এশিয়ার দুটি ক্ষমতাসীন অর্থনীতির দেশের মধ্যেও বৈষম্যের নিরিখে ভারত এগিয়ে—তথ্যে তা স্পষ্ট। ১৩ কোটি মানুষ কেবল চিকিৎসা খাতে বিপুল খরচের কারণে দারিদ্রের ফাঁদে পড়েছে। সম্প্রতি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ মন্তব্য করেন, ২৭০০ টাকা দামের ওষুধের এমআরপি ২৭ হাজার টাকা হয়, তাহলে তা রোগীদের সাথে 'ব্রড ডে-লাইট ডাকাতি'র সামিল। বর্তমানে ভারতের নীতি আয়োগের রিপোর্টে বলছে—দেশে স্নাতকদের মধ্যে বেকারের হার ১৩ শতাংশ। নীতি আয়োগ আরও দাবি করেছে মাত্র ৮.২৫ শতাংশ স্নাতক তাঁদের যোগ্যতার সঙ্গতিপূর্ণ পদে নিযুক্ত। এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট উদ্বেগের। অসংগঠিত, স্কুলের গন্ডী পেরতে না পারা নাগরিকদের কাজের সুযোগ, বেকারত্ব নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গটি ভিন্ন। সেদিক থেকেও

অবস্থা আরও সঙ্গীন।

গ্লোবাল ভারতের যে কথা হামেশাই ভারত শাসকরা বলেন, তার ভিত্তি শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম। আর এই প্রজন্মের ৮.৩ শতাংশ মাত্র নিজ যোগ্যতার সঙ্গতিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। তথ্যগত অসঙ্গতি, অসত্য তথ্য পরিবেশন করে ২.৬ শতাংশ ডিজিপিকে ৭.৮ শতাংশ বাড়িয়ে দেখালেও, ভারত শাসকরা নিজেদের একমাত্র চক্ষুষ্মান দাবি করলেও বাস্তবতা বলছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রলয় কিন্তু শুরু হয়েছে। শুধু শুরু নয়, প্রলয় বেশ ঘনীভূত। তথ্যের কারচুপি না করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিন অর্থনৈতিক সঙ্কট যে আরও তীব্রতর হবে এই বিষয়ে কারো সন্দেহ আছে কি?

অফথ্যালমিক অপটিশিয়ান

আরতি অপটিক্যাল

অশোকনগর, বিল্ডিং মোড়, যশোহর রোড,
উত্তর ২৪ পরগনা

মোবাইল ঃ 9903498639, WhatsApp : 8918232791

অঞ্জলি অপটিক্যাল

৪নং শেরপুর, অশোকনগর (জনমঙ্গল মাঠের নিকট)
অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

মোবাইল ঃ 9679616528

এখানে কম্পিউটারের সাহায্যে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
সঠিক পাওয়ারের **আধুনিক ডিজাইনের চশমা এবং সানগ্লাস** এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

সঠিক মূল্যে ঘরে বসে বিজ্ঞাপন দিন

আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান, প্রতিদিন, এই সময়, গণশক্তি, কর্মক্ষেত্র, কর্মসংস্থান, The Statesman, Sanmarg, Telegraph, Times of India, Indian Express, Hindusthan Times, The Eco of India (English/Hindi), দৈনিক লিপি (বাংলা), ৩৬৫, কলম সহ বিভিন্ন বাংলা, English, হিন্দি পত্রিকার বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র।

ONLINE বিজ্ঞাপন সংস্থা।

The Gazette of India / Kolkata Gazette-এ বিজ্ঞাপন এর জন্য যোগাযোগ করুন।
N.G.O., Trust, Partnership Firm রেজিস্ট্রেশন, রিনিউ এর কাজ করা হয়।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

এক্সপার্ট এ্যাড এজেন্সি

২০/১, কে.এন.সি. রোড, বারাসাত স্টেশন ১নং প্লাটফর্মের পাশে,
PNB A.T.M. কাউন্টারের গলিতে।
প্রো: স্বপন স্বর্ণকার
Ph. : 9674701788 / 9231896208 (WA)

রাতের শেষ ট্রেন ফিরে যাবার পর

সুনির্মল বসু

রাতের শেষ ট্রেন ফিরে গেছে।

আজ আর বাড়ি ফেরা হলো না মৌলিনাথের। নির্জন ফাঁকা স্টেশন। শেডের নিচে কয়েকজন ভিখারী শুয়ে আছে। ব্যাগ থেকে কয়েকটা পুরনো খবরের কাগজের পাতা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল মৌলিনাথ।

এবার সোজাসুজি আকাশের দিকে তাকালো। নীল আকাশ। রাতের জ্যোৎসনা চরাচর জুড়ে। দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের উপর উতরোল হাওয়া। দূর আকাশে বাঁকা চাঁদ। নিকটে কোথাও নদী। জলের শব্দ। বাকি চতুর্দিক শুনশান।

চোখে ঘুমের আবেশ। হঠাৎ মনে হল, সামনের রেললাইন পেরিয়ে খুব পরিচিত কেউ কোনো মহিলা ওর মাথার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন একটা ছায়ামূর্তি।

চিনতে পারছো?

কে আপনি?

আমাকে তো তোমার না চেনবার কথা নয়।

আপনার গলাটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যেন বহুদিনের কত চেনা একজন মানুষ।

আমি রঞ্জনা। মনে পড়ে?

মৌলিনাথ উত্তেজনায় উঠে বসে।

বলে, সেকি, তুমি রঞ্জনা। এত রাতে এমন নির্জন স্টেশনে তুমি কি করে এলে? আহা, কতদিন পর তোমাকে দেখলাম।

সেসব দিনের কথা তোমার মনে পড়ে, মৌলি?

সব মনে আছে। আমি কিচ্ছুটি ভুলিনি।

প্রথম ভালবাসার কথা কেউ কি কখনো ভুলতে পারে!

ঠিক বলেছো। না পাওয়ার বেদনা নিয়ে একটা আস্ত জীবন কেটে গেল। বলো, কার দোষ?

কারো নয়। ভাগ্যের।

দুজনেই দুজনকে চেয়েছিলাম। ওরা হতে দিল না।

আমরা যেন দুটো সমান্তরাল রেললাইন। পাশাপাশি যেতে পারি। কিন্তু মিলতে পারিনা।

জানো, সুখের দিনে তোমার কথা মনে পড়ে না। বর্ষার দিনে, ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে, রৌদ্র দগ্ধ দুপুরে, গভীর নিশীথে তোমার কথা খুব মনে পড়ে।

সমাজ আমাদের সম্পর্ক মেনে নিল না। আমার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, স্বামীর অত্যাচারে আমি একজন ঘর ছেড়ে পথে নামলাম।

তাই নাকি! আমি এসবের কিছুই জানিনা।

জানলেই বা কি করতে? আমি যখন পরস্ত্রী। সমাজ আঙ্গুল উঁচু করে সমালোচনা করত।

জানি তো। তবু তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম।

তা আর হয় না, মৌলি। বাপের বাড়িতে এলাম। বাবা নেই। মা, দাদার সংসারে থাকেন। সেখানে আমার জায়গা হলো না।

তারপর?

তারপর ছোটখাটো কাজ জোগাড় করলাম। কোনমতে একলা বেঁচে থাকা।

তোমার কোন কষ্ট হয়নি?

পুরুষ শাসিত সমাজে একা বেঁচে থাকা, নিজেকে ভালো রাখা খুব চাপের।

এ কথা কেন, রঞ্জনা?

সমাজে ভালো মানুষ যেমন আছে, তেমনি সুযোগসন্ধানী হায়েনার অভাব নেই। একদিন আমার প্রাইভেট কোম্পানির ম্যানেজার শান্তনু চৌধুরী আমাকে অন্যায় প্রস্তাব দিল। আমি চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। মানে, ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

এমনটা না হলেও তো পারতো। সেদিন যদি তুমি পালিয়ে আমার কাছে চলে আসতে, তাহলে আজকের এই দিনটাকে দেখতে হতো না।

কিন্তু তা আর হলো কই! অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায় যায়।

মৌলীনাথ উঠে দাঁড়ালো।

বলল, কাছে এসো রঞ্জনা। আমি তোমাকে একবার ভালো করে দেখি।

রঞ্জনা কাছে এলো।

একি, তোমার গলার কাছে এমন গভীর ক্ষত কেন? তুমি কোনো ডাক্তার দেখাও নি? তুমি আমাকে বললে না কেন, ডাক্তার জয়ন্ত মিত্র আমার বন্ধু। তাঁকে দিয়ে তোমাকে একবার দেখাতাম।

রঞ্জনা জোরে জোরে হেসে উঠলো। বলল, পৃথিবীর কোনো ডাক্তারই আমাকে আর ভালো করতে পারবে না মৌলি।

কেন এ কথা বলছো?

সেই কতদিন আগে আমি মরে গেছি। আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, মৌলি। ওরা আমাকে বাঁচতে দিল না।

কথা শেষ করে, রঞ্জনা বলল, আজ যাই।

কোথায় যাচ্ছ? তুমি এখন কোথায় থাকো? পাহাড়ের গায়ে, নদীর পাড়ে, নাকি গভীর অরণ্যে?

আমাকে বলো, রঞ্জনা। এই কথাটা আমার জানা চাই।

আমার কোনো ঠিকানা নেই। আমার কোনো ঘর বাড়ি নেই। আমার কোনো শরীর নেই। হালকা হাওয়ার মতো, উদাসী বাতাসের মতো, মৃদুল তুলোর মতো আমার আত্মা যখন খুশি যেমন খুশি বাতাসে ভেসে বেড়ায়। আমি ভালো নেই মৌলি, আমি একদম ভালো নেই।

কোথায় যাচ্ছ? আমাকে বলে যাও।

আমাকে তুমি আর কখনো খুঁজো না, মৌলি।

ঝোড়ো হাওয়ার মতো স্টেশনের শেষ প্রান্তে গভীর অন্ধকারে অরণ্যের মধ্যে মিলিয়ে গেল রঞ্জনা।

মৌলিনাথ পিছন পিছন দৌড়ানো শুরু করলো। ও ঊর্ধ্বশ্বাসে

দৌড়াচ্ছিল।

কাঁধের ওপর একটা হাত এসে পড়ল। এক ভদ্রলোক বললেন, ভোর হয়ে গেছে। সিগনাল পড়ে গেছে। এখনই ফাস্ট ট্রেন আসবে। আপনি ওদিকে কোথায় ছুটছিলেন?

মৌলীনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে, সত্যিই কি রঞ্জনা এসেছিল। সেই রাতে যখন পাশে কেউ ছিল না, তখন ও একলা এসে ওর সঙ্গে দেখা করে গেল।

যা কিছু ঘটে গেল, তা কি স্বপ্ন? না, সত্যি?

তারপর ভাবল, আমার একলা জীবনে কতদিন রঞ্জনাকে কাছে পেতে চেয়েছিলাম !

মৃত মানুষেরা সব টের পায়। আমার কষ্টটা বুঝে ও বোধহয় সবার আড়ালে আমাকে একবার দেখা দিয়ে গেল।

MIRA ENTERPRISE



Prop. : Ashim Kumar Roy (Pinku)

Mobile : 9733623355

Wholesale Dealer of Basin & Commode,
Tank, Pipe & all bath accessories



Address : 571/4, Ashokenagar, P.O. & P.S. Ashokenagar
North 24 Parganas

With best compliments from



Mob: 9231503006
70037162798
arunkadhikary@gmail.com

DR. ARUN ADHIKARY

M. Com MBA/Finance), MA (Psychology-I/O-1st Class)
PGDPC (PGD on Pr on Psychological counseling), MA (Eco)
Phd. (Honorary) +Various Certificate Courses on Psychology from
AICTE, UGC NPTEL
Assistant Professor of I.I.E., Kalyani,
Department of MBA (Psychological counsellor and behavioural therapist,
Author on Mind & Management), Motivational Speaker Will Power Personality Developer,
Psychosomatic diseases healer.



ড.অরুণ অধিকারীর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ:-

রোহিনীনন্দন প্রকাশনী থেকে

1) মাত্র ৯০ দিনে মস্তিষ্ক ক্ষমতা বৃদ্ধির ১০১টি উপায়।
(2) মন ব্যবস্থাপনা
(3) সুচিন্তায় নীরোগ, কু-চিন্তায় রোগ।

প্রকাশিতব্য বই

1) প্রেম প্রীতি ভালোবাসা বনাম অর্থনৈতিক উন্নতি
2) সন্তান এখন কথা শোনে না।
3) সাগরিকা আমি একা—(কাব্যগ্রন্থ)



সত্তরের দশকে দুই বাংলার রূপ এবং মেধাশক্তি

জগদীশ মণ্ডল

'পা দুটো কেটে বাদ দাও/তবু আমি হাঁটবো/ আমার পথে/ হাত দুটো কেটে বাদ দাও/তবু আমি বাজাব/ আমার সুর / চোখ দুটো উপড়ে ফেল/ তবু আমি দেখব আমার স্বপ্ন।' বিপুল চক্রবর্তীর কলমে আঁকা হয় সত্তর দশকের মেরুদন্ড উঁচু রাখার ক্রোড়পত্র। বাংলার ইতিহাসে সত্তর দশকের এক ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা আছে। তাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে গেলে পিছন ফিরে দেখার প্রয়োজন। পেছনে তাকানো দরকার বাংলা ও বাঙালির ভবিষ্যতের স্বার্থেই। অতীতের অধিকার অর্জন ও ভ্রান্তি দুইয়ের থেকে ঠিকমতো শিক্ষা নিতে না পারলে সত্তর দশকের টালমাটাল অবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে না। এই বাংলা বলতে যে ভৌগোলিক অঞ্চলটি সেটি আবহমান কালব্যাপী বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর ভূখণ্ডকে বুঝি। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে আজ আর সেই ভূখণ্ডটি অখণ্ড নেই। দুটি আলাদা মানচিত্রের দুই রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যবর্তী পরিস্থিতির শিকার।মিলটুকু অনেকটা অন্তলীন।তবে এই মিলটুকু বুঝতে গেলে ফিরে যেতে হবে বিংশ শতকের সত্তরের দশকের বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে। কাঁটাতারের এপারে বাংলায় নকশাল আন্দোলন ও তার সাময়িক ব্যর্থতা। আর ওপারে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। এই দুটি ঘটনা বাংলার সমাজ জীবনে পরবর্তী সময়ে বিশেষ প্রভাব ফেলে। যার পরিণতি আজকের বাংলা। কাঁটাতারের দুই পারে সিক্ত নয়নে তাকিয়ে থাকা দুটি বাংলা।

এপার বাংলায় যখন নকশাল আন্দোলনের হাত ধরে বাংলার ছাত্র ও যুব সমাজের মেধাবী ছেলেমেয়েদের একটি বড় অংশ সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। সেই সময় ওপার বাংলার যুবসমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই স্বাধীন দেশ গঠনে দু'চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে দিনে দিনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। কাঁটাতারের দুই পারের বাঙালী মনীষা ও মেধাবী যুব সমাজ প্রচলিত রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে একটু একটু করে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। এই অবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গেল সত্তর দশকের প্রথম দিকে। রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল স্বাধীনতা পরবর্তী খন্ডিত বাংলা। জীবন ও সংস্কৃতিতে পড়ল তার স্পষ্ট ছাপ। সত্তরের আগে থেকে শুরু হওয়া খাদ্য আন্দোলন, দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনের অসারতা, অভূতপূর্ব উদ্মাদনার মধ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো। কিন্তু শান্তি এলো কই! ঘটলো ভয়ংকর নকশালবাড়ির মতো কলঙ্কিত ঘটনা, 'বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ'। এভাবে রচিত হলো বাংলার, 'মুক্তির দশক'। সত্তরের অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয় বন্দুকের গর্জনে। বন্দুকের নল হল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। উত্তরের তরাই থেকে দক্ষিণের সাগর সঙ্গম। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার প্রচেষ্টা, শ্রেণি শত্রু খতম করা। গোপন ডেরা থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ। অপরদিকে রাষ্ট্রের চরম দমন পীড়ন নীতি। এমন গোলাবারুদে পূর্ণ প্রত্যক্ষ কার্যক্রমে বিপর্যস্ত ও রক্তাক্ত সত্তর দশক ছিল পূর্বের দশক থেকে অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির। বিপ্লবী হিংসা, প্রতিবিপ্লবী প্রতিহিংসায় পীড়িত হল বাংলার গ্রাম, শহর, শহরতলী। সন্ত্রাস ও মৃত্যু কবলিত বাংলায় দেখা দিলো বিপন্নতা। শোক, দুঃখ, প্রতিবাদ প্রতিরোধের আগুনে উত্তপ্ত এক ক্রান্তিকাল হয়ে ওঠে সত্তরের দশক। এই উত্তাপ স্পর্শ করলো কবির কলমকে। নবারুণ ভট্টাচার্য বারুদ সময়ের পরিস্থিতি চিত্রিত করেন, 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না/ এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না/ এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না/ এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না।'

এপারে যেমন কিছু বিকৃত স্বপ্ন দেখা যুবশক্তির আস্ফলনে ভূলুণ্ঠিত হল উচ্চ মেধা, দেখা দিল মেধার আকাল। অন্যদিকে ওপার বাংলায় ঘটলো একই ঘটনা তবে অন্যভাবে। আন্তর্জাতিক বিরুদ্ধ শক্তি যখন দেখলো পাকিস্তানের পক্ষে আর কোনোভাবেই বাংলাদেশকে পরাধীন করে রাখা সম্ভব নয় তখন তারা ওপার বাংলার মেরুদন্ডকে ভেঙে দিতে মেধা শূন্য করার খেলায় মাতলো। বুদ্ধিজীবীরা মেধা শক্তি হত্যার নীল নকশা ধরিয়ে দিল রাজাকার, আলবদরদের হাতে। ফলে পাকিস্তানের হাত থেকে স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ নামক পৃথক দেশ গঠিত হলো বটে, কিন্তু জাতি ও সমাজকে দশকের পর দশক নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মেধা পেল না। মধ্য মেধার দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল রাষ্ট্র ও সমাজের নানা জায়গায়। যার চূড়ান্ত রূপ পেল বর্তমান বাংলাদেশ।

ওপার বাংলায় লোকক্ষয় দিয়ে শুরু হয়েছিল সত্তরের দশকটি। টর্নেডো, বন্যা আর সাইক্লোনে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে।আরও শোচনীয় করে তোলে ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর মারন রোগের ছোবল। কত লোকের প্রাণ চলে যায়, কত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয় তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে বলা হয়েছিল পনেরো লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড় দিয়ে শুরু হয় আর খরা দিয়ে শেষ হয় এই দশক। আবার জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় দশকও এটি। কারণ স্বাধীন জাতি হিসাবে স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে গৌরবময় যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিল বাংলাদেশের জনগণ।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশকে বুঝতে হবে, দেশকে স্বাধীন করতে পারলেই দেশ গড়া যায় না। দেশ গড়তে গেলে সবার আগে দরকার সঠিক দিশা এবং সমাজ বিপ্লবের। বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ সেভাবে হয়নি। যার ফলে বিষময় ফল ফলল হাতেনাতে। সমাজ বদলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নানা আশায় বুক বেঁধেছিল যে তরুণ যুবসমাজ, এগিয়ে এসেছিল সাহস নিয়ে। তাদের ছিল প্রতিবাদের ভাষা। কিন্তু সঠিক পথে পরিচালনা করার নেতৃত্বের ছিল অভাব। যা সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের কাছ থেকে চয়ন করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হয়নি বলেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বিপ্লবী আন্দোলন। বিপথে পরিচালিত করে রাষ্ট্রীয় শক্তি। দমন, পীড়ন, প্রশাসনিক তৎপরতায় সুযোগ ভোগী রাষ্ট্রশক্তি আন্দোলনকে জনবিচ্ছিন্ন করে দেয়। এভাবে সমূলে বিনষ্ট করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি

তাদের।তার উপর প্রশাসনের কাজে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জুটে গেল গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রসাদ ভোগী রাজনৈতিক দলগুলির। ফলে জনবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের অভিমুখ ঘুরে গেল সম্পূর্ণ ব্যর্থতার দিকে। শহীদ হলেন কতশত মেধাবী যুবক। যার করুণ চিত্র ধরা পড়ল কবির কবিতায়। সব্যসাচীর কলমে শহীদের মা কিভাবে তার মৃত পুত্রের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তা তুলে ধরেছেন,ক্ষ্ণ তুই ঘুমো খোকন/ তোর কুঁকড়ে যাওয়া/ নীল ঠোঁটের পাশ দিয়ে এখন আর/ রক্ত গড়িয়ে পড়ছে না, পাতা খোলা/ কমিউনিস্ট ইশতেহারের/ উপর; তোর খুবলে আনা চোখের গহ্বরে/ শুধু জমাট বেঁধে আছে বিশাল স্বপ্ন।ক্ষ্ণগোটা প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মেধাই বিনষ্ট হয়ে গেল। সেই সঙ্গে দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ মেধার শূন্যস্থান পূরণ করতে উঠে এলো মধ্য মেধা। তাদের উল্লম্ফনের প্রভাব পড়ল সমাজের সর্বস্তরে।

সত্তরের দশক বর্তমানের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া রূপরেখা ঠিক করে দিল। তবে একটা নিশ্চয়তা দিল তাদের যারা ক্ষমতার বিত্তকে নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে ধরে রাখতে চেয়েছিল। তারা সফল হল দু'পারেই। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এটা যে মূল অভিঘাতটা পড়ল বাংলার মেধা এবং মনীষার উপর। পুরো একটা প্রজন্মের মেধা নষ্ট করে দেওয়া হল সম্পূর্ণ নিপুণভাবে। ফলে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটিকে সমাজের সর্বস্তরে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিশেষ আর কেউ থাকলো না। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশটি ঝড়ো হওয়ার মতো উড়ে এলো সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী, গোষ্ঠীগুলি। সমাজের সর্বস্তরে তারা বিনা বাধায় হাতে পেয়ে গেল ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি। ফলে এপার বাংলা ওপার বাংলায় শুরু হল মধ্য মেধার ক্ষমতায়ন। স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী নানা গোষ্ঠী পারস্পরিক রেষারেষি ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল। যার ফল ভালো হয়নি, সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশ দেশটির।

বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠল সত্তরের দশক। এই দশকে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এরপর পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। একটি স্বতন্ত্র রাজশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সংবিধান গৃহীত হয় বাংলাদেশে যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিতকে শক্তিশালী করে। সংবিধান সকল নাগরিকের সমাধিকার ও মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করে। কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দে পা রাখা মধ্য মেধার দাপাদাপি শেষ হয়নি। ফলে তার খারাপ ফল ফলতে শুরু করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সামরিক শাসন কালে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গতি হারায়। ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করে।

সত্তর দশকে দুই বাংলায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে যায়। এপার বাংলায় কংগ্রেসের পরিবর্তে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। ওপার বাংলা পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পায়। নতুন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। সত্তরের দশকের যে আন্দোলন সেটি কোন বিচ্ছিন্ন বা বিদেশ প্রানিত ঘটনা নয়। দেশের প্রয়োজনে, দেশের মাটি থেকে এর উদ্ভব। গ্রাম শহরের এ যাবৎ যে বিচ্ছিন্নতা দুই বাংলার প্রচন্ড অভিঘাতে তা ভেঙ্গে যায়।নকশালবাড়ির বিপ্লবী কবি জেলের দেয়ালে ফুটিয়ে তোলেন, 'ভাঙছি বলেই সাহস রাখি গড়ার/ ভাঙছি বলেই সাজিয়ে নিতে পারি/ স্বপ্নের পর স্বপ্ন সাজিয়ে তাই/ আমরা এখন স্বপ্নের কারবারি।' এই দশক চোখকে শিক্ষা দেয় ঠিকভাবে দেখতে। আমরা আবিষ্কার করি ভারতবর্ষ জরুরী অবস্থায়ও তার মেরুদন্ড সোজা রাখতে সক্ষম। তবে ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক নিরন্ন, ভূমিহীন, ভূমিদাস, বঞ্চিত ক্ষেতমজুর, শোষিত ছোট চাষি, হতদরিদ্র জঙ্গলজীবী, কয়লা ও অন্য খনিজ খাদানে ঠিকাদারের শিকার। আমরা দেখতে পাই সেই ভারতবর্ষকে যে আমাদের উটপাখি সত্তাকে বালি থেকে ঠেলে তুলে এই লক্ষ কোটি মানব জীবনের যন্ত্রণা দেখতে শিখিয়েছে। এই দশকে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মনে স্থায়ী ও পালিত বিশ্বাসকে বর্জন করে নতুন করে দেশ ও মানুষ বিষয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। কোন কিছু স্থিতাবস্থা ঠিক নয়। চিন্তার পরাধীনতা দাসত্ব ত্যাগ করে নিজের চোখে দেখো নতুন করে ভাবো। অরি মিত্র তাঁর, 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' লেখায় তুলে আনেন, 'এপার বাংলা ওপার বাংলা/ ছড়ানো প্রান্তর/ ভাগ হয়ে গেছে আত্মীয়জন/ ভাগ হয়ে গেছে ঘর।/ এপার বাংলা ওপার বাংলা/ বুকের মধ্যে আশা/ একই আকাশ একই বাতাস/ একই বাংলা ভাষা।'

গ্রন্থ ঋণ:

(ক) অনুষ্টুপ প্রকাশনা -বিতর্কে নকশালবাড়ি ও নকশালবাড়ির বিতর্ক (২২/০৪/২০২০)।

(খ) এপার বাংলা ওপার বাংলা: অরি মিত্র(২৬/০৬/২০২০)।

(গ) সত্তরের দশক এবং তারপরে: মহেশ্বেতা দেবী(২৪/০৫/২০২০)।

*আকর্ষণীয় খবর দেখতে নজরে রাখুন **গ্রামবাংলার খবর অনলাইন***

grambanglarkhabar.com

গ্রামবাংলার খবর ফেসবুক পেজ, grambanglarkhabar ইউটিউব ফলো করুন।

প্রসঙ্গ জল সংকট : একটা খোঁজ

সুবীর সাহা

জলের দরে বিক্রি এই কথাটা একসময় আমাদের মধ্যে বেশ চালু ছিল। এখনও এই ধারণাটা একেবারে মুছে যায়নি। কয়লা, পেট্রোলিয়াম-সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করার ক্ষেত্রে যে প্রতিরোধ, বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় জলসম্পদ লুঠের ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় না বললেই চলে। অর্থাৎ পানীয় জলের সংকট আজ বিশ্বজুড়ে। এক বালতি পানীয় জলের জন্য মানুষ মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছেন এটাও আমরা দেখেছি। দেশের নীতি আয়োগ রিপোর্ট বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ আর পানীয় জল পাবে না।

ভারতে ৬০ কোটি মানুষ প্রবল জল সঙ্কটের মুখে পড়েছে। চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ-সহ ২১টি শহরে জল শেষ হতে চলেছে। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার জল অর্থাৎ মিষ্টি জল যা মানুষ পানীয় এবং কৃষিকাজে ব্যবহার করে। পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থল এটাতো আমাদের জানা কথা। এই জলের ৯৭.২ ভাগ জল নোনা জল। এই জল জীব জগতের পানের উপযুক্ত নয়। বাকী ২.৮ ভাগ জল হল মিঠা জল। এই জলের স্বাদ মিষ্টি এটা ভাবলে ভুল হবে। এই জল নোনা নয় বলে মিষ্টি জল বা মিঠে জল বলা হয়। বেশিরভাগ পশু পাখি বেঁচে থাকে এই জলের কল্যাণে। অবশ্য কিছু গাছপালা, জীবজন্তু বেঁচে থাকে নোনা জলের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর পিঠের উপর যে পানীয় জল থাকে তার পরিমাণ ২.২ ভাগ। বাদবাকী ০.৬ ভাগ জল থাকে মাটির নীচে। এই মাটির নীচের জলকেই আমরা ভূগর্ভস্থ জল বলি, যে জল আমরা নলকূপ থেকে পেয়ে থাকি। আবার এই ভূগর্ভস্থ জলের সবটুকু আমরা পাই না। মাত্র ০.৩ ভাগ জলের নাগাল আমরা পাই।

একথা সকলেরই জানা যে, মানুষ-সহ প্রাণমণ্ডল জলছাড়া একদিনও বাঁচতে পারে না। মানুষের অস্তিত্বের প্রয়োজনে ন্যূনতম জলের দরকার। আজকের পৃথিবীব্যাপী জলের সংকট শুধুমাত্র কোনও আলাদা সংকট বলে ভাবা ভুল হবে, আসলে এটা মুনাফামুখী লুঠেরা সভ্যতারই অস্তিত্বের সংকট। প্রতিটি জলাধার প্রাকৃতিক সম্পদ। স্বাভাবিকভাবেই জলসম্পদের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু এখন পুরো ধারণাটাই পাল্টে গেছে। অন্যান্য দেশের কথা বাদই দিলাম, আমাদের দেশে পুকুর, জলাভূমি ভরাট করে দেদার বিক্রি চলছে (যদিও এটা বেআইনি)। কোথাও কোথাও নদীও বিক্রি হচ্ছে। ধনী চাষীরা নিজের জমিতে গভীর নলকূপ বসিয়ে মাটির নীচের জল তুলে পাশের জমির চাষীকে বিক্রি করছে। মাটির নীচের জল সংরক্ষণের জন্য কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।

আজকাল বোতলবন্দী জল বিক্রির এক রমরমা ব্যবসা চলছে। বেশ কিছুটা জমি কিনে নিয়ে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাটির নীচের জলকে সাজিয়ে গুছিয়ে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। মজা হচ্ছে, যে জমিটুকু কিনে জল তোলা হচ্ছে, তার নীচে প্রতিদিন মোট তোলা জলের সামান্যই থাকে। আশেপাশের জমি শুধু নয়—পুকুর, নদীর জলও জমির নীচের জলাধারে পৌঁছায়। সেই জলই বেতালবন্দী হয়ে বাজারে পৌঁছায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই আশেপাশের জায়গাগুলো জলস্তর নেমে যায় এবং সাধারণ মানুষকে জলাভাবের সম্মুখীন হতে হয়।

একটা রিপোর্টে জানা গেছে, পেপসি-কোকাকোলার ৯০টির বেশি কারখানা প্রতিদিন ৫ থেকে ১৫ লক্ষ লিটার ভূগর্ভস্থ জল বের করে নিচ্ছে। এই দুই মার্কিন কোম্পানির দৌলতে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমাগত নিম্নমুখী। উদাহরণ, রাজস্থানের কালাডেরা গ্রাম এবং বেনারসের ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমের গ্রাম মেহেদিগঞ্জ। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, কোকাকোলা কোম্পানি অতিরিক্ত জল শুষে নেওয়ায় জলস্তর নেমে যাচ্ছে। এর ফলে নলকূপগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে।

ফলন বৃদ্ধির নামে দেশজ বীজ ও চাষের প্রক্রিয়াকে বিসর্জন দিয়ে তার জায়গায় এমন এক কৃষি ব্যবস্থা (হাইব্রীড ও কীটনাশক নির্ভর) চালু করা হয়েছে যেখানে অফুরন্ত জলের প্রয়োজন। আর এই জল জোগান দেওয়া হচ্ছে পাম্পের সাহায্যে মাটির নীচ থেকে।

এরপরেও আছে নগরায়ন সৌন্দর্যায়নের নামে বেপরোয়া গাছ কাটা (গাছ মাটি, জল ধরে রাখা, জল সম্পূরণের কাজে বড়সড় ভূমিকা পালন করে)। গোটা শহরটাকে কংক্রিটে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। বৃষ্টির জল জমা হবে কোথায়? জমা জল কংক্রিট ভেদ করে মাটির নীচে জমা হবে কিভাবে? এসবের কোনও ব্যবস্থাপনা নেই। মাটি ও গাছ অবিশ্বাস্যভাবে কমে যাওয়ার কারণে দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই-এর মানুষেরা জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। একদিকে জলাধার কমছে, অপরদিকে মাটির নীচের জল শুষে নেওয়া চলছে। মাটির নীচের জল সম্পূরণ না হওয়ার ফলে সংকট তীব্রতর হচ্ছে, মাটির নীচের জলস্তর নেমে যাচ্ছে...।

এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে কতগুলো নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। প্রথমে জল অপচয় বন্ধ করা দরকার। ওয়াটার পার্কের নামে হাজার হাজার গ্যালন জল অপচয় করা হচ্ছে। এসব বন্ধ করা দরকার। বন্ধ করা দরকার জল মাফিয়াদের দৌরাত্ম। এর বিকল্প ঘন ঘন নলকূপ বসানো দরকাব, যা এলাকার মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মেটাবে। জরুরী ভিত্তিতে পুকুর ভরাট বন্ধ করা দরকার। নদী-সহ জলাধারগুলোর সংরক্ষণ জরুরী। এছাড়াও বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য দরকার রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং। যেমন বর্ষাকালের বাড়ির ছাদের জল যে পাইপ দিয়ে মাটিতে পড়ে সেখানে ৫ থেকে ৮ ফুট গর্ত করে মোটা মাঝারি সরু পাথরের স্তর দিয়ে সবার উপরে বালি দিয়ে অন্তত ছাদের জলের কিছুটা মাটির নীচে পাঠানো যাবে।

বৃষ্টির জলকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে দেশজ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায়। দেশজ পরম্পরাজাত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই রাজেন্দ্র সিং রাজস্থানের ১০০০ গ্রামের শুকিয়ে যাওয়া কূয়ো, পুকুরের জল ফিরিয়ে আনেন। এটা তিনি করেছিলেন প্রাচীন জোহাদ পুনরুদ্ধার

জল সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক বা মাটির তৈরি চেক ড্যাম স্থাপনের মধ্য দিয়ে। গান্ধীবাদী রাজেন্দ্র সিং ও তার চার বন্ধু যখন রাজস্থানের আলোয়ার জেলার কিশোরীগ্রামে আসেন তখন গ্রামটি 'কালা অঞ্চল' হিসেবে পরিচিত। কূয়ো, পুকুরে জল নেই সব শুকিয়ে কাঠ। চাষবাস বন্ধ। পেশায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক রাজেন্দ্র পাশের গ্রাম বিক্রমপুরায় একটা থাকার জায়গা পান এবং সেখানে তিনি চিকিৎসা চালাতে থাকেন। আর তার চার বন্ধু এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের কাজ করতে থাকেন। একদিন গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা মঙ্গুলাল আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আজকের এই জল সংকট দূর করতে গেলে জোহাদগুলো পুনরুদ্ধার করে বর্ষার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, তাহলেই আবার পুকুর, কূয়োগুলোতে জল ফিরে আসবে। একসময় এই জোহাদগুলো বর্ষার জল ধরে রাখার কাজটা করত। কিন্তু জোহাদের বদলে নলকূপ প্রচলনের ফলে জোহাদ ব্যবস্থাটা নষ্ট হয়ে যায়। নলকূপ মাটির নীচের জল চুষে নেয়। ফলে জলস্তর ক্রমাগত নীচে নামতে থাকে। রাজেন্দ্র সিং মঙ্গুলালের কথামতো বৃষ্টির জল সংরক্ষণের বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামের কিছু উৎসাহী যুবককে সঙ্গে নিয়ে গোপালপুরায় জোহাদ সংস্কারের কাজে হাত লাগান। এরপর বর্ষা আসে। বর্ষার জলে জোহাদ পূর্ণ হয়ে যায়। পুকুর, কূয়োগুলিতে আবার জল ফিরে আসে। মাটির নীচের জলস্তর উপরে উঠে আসে। আবার নতুন করে চাষবাস শুরুর পরিসর তৈরি হয়। একই ভাবে রাজেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত তরুণ ভারত সংঘের উদ্যোগ চেক ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করে গ্রামগুলোর শুকিয়ে যাওয়া কূয়ো পুকুরগুলিতে জল এনে দেয়।

আরভরী নদী ছিল মজে যাওয়া অবস্থায়। রাজেন্দ্র সিং এর 'তরুণ ভারত সংঘ'র স্বেচ্ছাসেবক এবং নদী সংলগ্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীদের উদ্যোগে জোহাদ এবং ছোটো ছোটো মাটির চেক ড্যাম এবং কংক্রিট ড্যাম নির্মাণ শুরু হয়। এই ধরনের জোহাদ বা ড্যামের সংখ্যা ৭৫-এ পৌঁছালে আরাভারী নদীতে আবার জল বইতে শুরু করে।

কেন্দ্রীয় জল কমিশনের একটা রিপোর্ট বলছে, ভারতে বার্ষিক জলের প্রয়োজন ৩০০০ বিলিয়ন ঘন মিটার। আর প্রতি বছর বৃষ্টির মাধ্যমে ভারত গড়ে ৪০০০ বিলিয়ন ঘন লিটার জল পায়। সমস্যা হলো, ১৩০ কোটির দেশ বৃষ্টির মাধ্যমে প্রাপ্ত জলের তিন চতুর্থাংশও কাজে লাগায় না। ভূগর্ভস্থ জল মূলত পানের জন্যই। যদিও এদেশে কৃষি ও শিল্পে ব্যবহৃত জলের ৮০ শতাংশ মাটির নীচের জল। কৃষি ও শিল্পে মাটির নীচের জল ব্যবহার না করে জলের অন্যান্য উৎস ব্যবহার করা গেলে সমস্যা অনেকটাই কমবে। আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কর্ণাটকবাসী আইআপ্পা মাসাকি গাডাকের মতো খরাপ্রবণ এলাকায় ৬ একর জমি কিনেছিলেন। এলাকায় জলের পরিমাণ কম থাকায় সেখানে তিনি রাবার এবং কহিদর গাছ লাগালেন। বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হয়ে বুঝতে পারলেন জলাশয় তৈরি এবং নলকূপগুলির রিচার্জই এর একমাত্র সমাধান। জল সংরক্ষণের নিয়ম অবলম্বন করে পরবর্তী দুই বছর তিনি দারুণ ফসল ফলান। বর্তমানে ১১টি রাজ্যে আইআপ্পার জল সংরক্ষণের প্রকল্প চলছে এবং দেশ জুড়ে তিনি ৬০০টি হ্রদ নির্মাণ করেন...। সবটাই অন্ধকার নয়, এই সমস্ত ব্যক্তি বা সংগঠন জল সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষায় যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা আমাদের আশা জাগায়, পথ দেখায়।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন

পুজোর দিনগুলোতে নিজে প্রতিমা দর্শন করবেন এবং
অপরকে প্রতিমা দর্শন করতে সাহায্য করবেন।
সবসময়ে বয়স্ক ও শিশুদের প্রতি নজর রাখুন।
দেখবেন তাদের কোনও অসুবিধা না হয়।
সকল প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রণাম ও শুভেচ্ছা।
সকলকে জানাই অভিনন্দন।



সমীর দত্ত
আইনজীবী, বারাসাত ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট
অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

হাবড়ার নাগরিকদের জানাই দুর্গাপুজোর
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দুর্গোৎসবের দিনগুলি
সকলের আনন্দে কাটুক। সবাই ভালো থাকুন।



হাবড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি
প্রফুল্লনগর, হাবড়া
উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তমকুমার: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখে

ড. সফিয়ার রহমান

সালটা ১৯৬৭। সে বছর বাংলা চলচ্চিত্রের কোন ছবি সর্বোচ্চ আয় করে? এ উত্তর সকলের জানা, 'এন্টনী ফিরিঙ্গী'। উইকিপিডিয়া বা গুগল সার্চ করলে দেখা যাবে আজও সে তথ্য জ্বল জ্বল করছে। সুনীল ব্যানার্জি পরিচালিত 'এন্টনী ফিরিঙ্গী'র প্রধান চরিত্রে অভিনয় উত্তমকুমার ও তনুজার। এই মিউজিক্যাল ড্রামা ঘরানার ছবিটি সে বছর আনুমানিক ৮৬ লক্ষ টাকা রোজগার করে ব্যবসায়িক দিক থেকে শীর্ষস্থান দখল করে। এই ছবিতে উত্তমকুমার রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতিও পান। সেই বছরই মুক্তি পায় উত্তম অভিনীত 'চিড়িয়াখানা'। তার ঠিক আগের বছর মুক্তি পেয়েছিল 'নায়ক'। পরিচালক সত্যজিৎ রায় উত্তমকুমার ছাড়া আর কাউকে নায়ক ভাবতেই পারেননি 'নায়ক' ছবির জন্য।

চিড়িয়াখানা, নায়ক-সহ আগে পরে অন্য ছবিগুলো সাফল্য অর্জন করলেও 'এন্টনী ফিরিঙ্গি'র মতো চূড়া ছুঁতে পারেনি। এই ছবি পারল কী কিরে? মাথায় রাখতে হবে, তখন বাঙালির ললাট-লিখনে খুব ভালো সময় লেখা ছিল না। ষাটের দশকে নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতন শুরু হয়। ৬৬-৬৭ সালেই পাওয়া যাচ্ছিল বঙ্গ রাজনীতির অশুভ সংকেত। আটষট্টির শুরুতে ফেব্রুয়ারি মাসেই জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন। এমন এক অস্থির সময়ে কীভাবে এই ছবি সাফল্য পেল? আসলে 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' বাঙালির সমাজজীবনে অন্য ভাবনার জন্ম দিয়েছিল। অনেকে বলবেন যে এই ছবিতে উত্তমকুমার এত স্বাচ্ছন্দ্য অভিনয় করেছিলেন যে বাঙালি সিনেমা হলেই কেঁদে ভাসিয়েছিল। এটা শুধু অভিনয় প্রতিভায় সম্ভব হয়নি, হয়েছে চরিত্রের সঙ্গে গভীর বিশ্বাসে একাত্মবোধ। তা না হলে এই অভিনয় সম্ভব হতো না। আর বাঙালি কেঁদেছিল কেন? বল্লভভাই প্যাটেলের কথায় 'বাঙালি কাঁদুনে জাত', তাই? আসলে বাঙালিকে এই ছবি বিশ্বাস করাতে পেরেছিল খ্রিস্টানদের গড, মোসলমানের আল্লা আর হিঁদুর কৃষ্ণ এক। এ্যান্টনি ফিরিঙ্গী পর্তুগীজ হলেও তিনি বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়েছেন। সেই বিখ্যাত গানের কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—'খ্রিস্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই/শুধু নামে ফেরে মানুষ ফেরে/এও কোথাও শুনি নাই/আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে/ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে/আমার মানব জনম সফল হবে/যদি ঐ রাঙ্গা চরণ পাই।' এটাই বাঙালির চিরন্তন বিশ্বাস ও ভাবনা। সেই ভাবনা কি এক লহমায় কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের হিন্দুত্ব বা ঐসলামিক তত্ত্ব দিয়ে মুছে ফেলা যায়? সেই চিরায়ত আদর্শের সঙ্গে উত্তম একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই না বাঙালি করুণরসে সিক্ত হয়েছিল।

আর অভিনয়? সেটাও তো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার নয়। অভিনয় যে সিনেমার প্রাণ সেকথা অনস্বীকার্য। অভিনয়ে প্রাণ সৃষ্টি করতে না পারলে সিনেমা নিষ্প্রাণ জড়বস্তুতে পরিণত হয়। সেই প্রাণ সৃষ্টি হয় আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। উত্তমকুমারের মধ্যে সেই নিষ্ঠা কতটা ছিল তা জানতে বয়সে কিঞ্চিৎ ছোট সমসাময়িক অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হতে হয়। সৌমিত্র বলেছেন, 'আমার কীরকম যেন মনে হয় যে, উত্তমকুমারের সমসাময়িক যাঁরা--- দিলীপকুমার, রাজকাপুর, দেবানন্দ ইত্যাদি---- এমনকি পরেও কিছুটা--- ঐ অমিতাভ বচ্চন প্রভৃতি---- এদের সকলের চাইতে আমার কাছে উত্তমকুমার বেশি প্রিয় নায়ক। আমি জানি না, আমি অভিযুক্ত হতে পারি যে আমি বাঙালি বলে বা তাঁর বাল্যবন্ধু বলে এরকম বলছি। তা নয়, আমার এটা আরও মনে হয় এই কারণে যে, প্রেমিকের রোলটা উনি যে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে, যে-পারফেকশনের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন, ততটা পারফেকশন কিন্তু আমি এঁদের মধ্যে পাই না।'[১]

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, উত্তমকুমারের মধ্যে একটা দোটানা ছিল, স্টার হবেন না অভিনেতা হবেন, সেখানে তিনি নিজেই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলেছেন এইভাবে যে স্টারটাই অভিনয়, ওটাই একজন অভিনেতার আল্টিমেট ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সত্যিই কি তাই? তিনি নিজের ইমেজে খানিকটা বন্দী হয়ে গেলেও সেই বন্ধন ভাঙতে চেয়েছেন আরও ডেভেলপ করার জন্য। তাঁর সময়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জানতেন যে তিনি অসম্ভব ভালো ছবি দেখতেন, ভালো অভিনেতাদের অভিনয় দেখে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতেন। হয়তো সেখান থেকেই উত্তমকুমারের স্টার ইমেজটা এসে থাকতে পারে।

দৈহিক দিক বিচার করলে উত্তমকুমারের ঠোঁট মোটা, নাকটা সার্প নয়, কপাল চওড়া। কিন্তু অভিনয়ের ব্যাপারে তাঁর ছিল খুব নাক উঁচু। উন্নাসিক উত্তমকুমার অনেক চরিত্রে অভিনয় করতে চাননি। বিশেষ করে নন-গ্ল্যামারাস কোনো চরিত্রে তিনি অভিনয় করতে চাইতেন না। চাইতেন না বলে অন্য অভিনেতার কপালে সিকে ছিঁড়েছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'উনি তো 'সংসার সীমান্তে'র অঘোর করতে চাননি। 'অভিযান' -এর নরসিংহ করতে চাননি। সেজন্য আমি রোলটা পেয়েছিলাম। মানিকদা তখন ডিরেক্টর ছিলেন না। বিজয়দা ছিলেন পরিচালক। উত্তমদাকে বলেছিলেন যে, 'তোমাকে ডিগ্ল্যামারাইজ করতে হবে'। তাইতেই উনি বলেছিলেন, 'না, আমি ওসব করব না'।[২]

প্রত্যেকটা মানুষের একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। সেটা বুঝে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম যে করতে পারে সেই তো সাফল্যের চাবিকাঠি হাতে তুলে নিতে সক্ষম হয়। উত্তমকুমার নিজের লিমিটেশন বুঝতেন। আর সেই সীমানা পাড়ি দেওয়ার জন্য যে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন উত্তমকুমার তা খুব কম অভিনেতাই পারেন। অকপটে সৌমিত্রবাবু বলেছেন, 'দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। একটা সংলাপে, সেই শটটায় আমি নেই, আমি ক্যামেরার পাশে মোড়ায় বসে আছি। আর উত্তমদা একটা

লম্বা সেন্টেন্স -এ বোধহয় টুইস্টার, এরকম দু-তিনটে র-ফলা ঋ-ফলা কী সব ছিল, বার বার আটকে যাচ্ছেন। বার চারেক হয়ে যাবার পর, এন জি হচ্ছে ক্রমাগত। আমি মোড়া থেকে উঠে গিয়ে বললাম, আরে এটা বাজে একটা শট। এটা বদলে দিতে বল না? উত্তমকুমার যদি সেই সময় কোনও ডিরেক্টরকে বলতেন যে, 'অ্যাই, এই লাইনটা বলব না। পাল্টে দাও' তো তিনি পাল্টে দিয়ে ধন্য হতেন। তখন তাঁর এত প্রতাপ, এত প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তা না করে তিনি বললেন, 'আরে বোস না, এক্ষুনি হয়ে যাবে। এটা ঠিক করে বলে নিয়ে তারপর চা খাব।' দিলীপ বলল, 'একটা টি ব্রেক দিই।' উনি বললেন, 'না না, আগে এই শটটা ঠিক করব।' ছ-সাতটা টেক এন জি হওয়ার পর আমায় বললেন, 'পুলু তুই একটু বাইরে যা তো।' আমি তো অবাক হয়ে বেরিয়ে এলাম। আট না নয় নম্বর টেক-এ ওকে করে বাইরে এসে বললেন, 'দে, তোর ভাল সিগারেট একটা দে।'[৩] পরে সৌমিত্রবাবু উত্তমকুমারের কাছে জানতে চাইলে উত্তমকুমার বলেছিলেন তাঁর খুব সেল্ফ-কনশাস লাগছিল। তাই তাকে বাইরে যেতে বলেছিলেন। উত্তমকুমার একটু আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন যে তাঁর জিভটা মোটা। তাই উচ্চারণটা স্পষ্ট হচ্ছিল না। তখন উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তার একেবারে শিখরে। ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের লিমিটেশনকে স্বীকার করার ক্ষমতা ক'জনের হয়। সেই জন্যই তিনি মহানায়ক।

মহানায়ক উত্তমকুমারের জীবনে সাফল্য যেমন এসেছে, তেমনি হতাশা ও ব্যর্থতা এসেছে। আমি শুধু প্রথম জীবনে পর পর ব্যর্থ ছবির কথা বলছি না, বলছি শেষ দিকে তাঁর যন্ত্রণাহত ও হতোদ্যম হওয়ার কথা।

সৌমিত্রবাবু সময়টা উল্লেখ না করলেও উত্তমকুমারের অভিনয়জীবনের শেষ দিকের একটি ঘটনা। ইন্ডাস্ট্রিতে ঘন ঘন লোডশেডিং শুরু হল। এর বিহিত করতে ইন্ডাস্ট্রিতে একটা মিটিং ডাকা হল। কনভেনার ছিলেন সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মিটিংয়ে টেকনিশিয়ান স্টুডিওয় প্রচুর মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। ঠিক হল তাঁরা সরকারের কাছে ডেপুটেশন দেবেন। নির্দিষ্ট দিনে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে একত্রিত হয়ে তাঁরই গাড়িতে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছিলেন। পেছনে বসেছিলেন উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নানা গল্পের মধ্য দিয়ে উত্তমকুমার মানিকবাবুকে বললেন, 'কী মানিকদা, আমাকে আর ছবিতে নিচ্ছেন না।' মানিকদা বললেন, 'তুমি এমন একটা বয়সে পৌঁছেছ, না বুড়ো না জোয়ান! এই বয়সের রোল না পেলে তো আর তোমাকে নেওয়া যায় না। এই বয়সের রোল পাওয়া মুশকিল।' সৌমিত্রবাবু ইয়ার্কির ছলে ব্যাপারটা হাল্কা করার চেষ্টা করলেও হাল্কাভাবে নেননি উত্তমকুমার। তারপর প্রায়ই তিনি হতাশায় ক্লান্ত হয়ে বলতেন, 'দুর আর ভাল লাগছে না।' একদিন 'ভাল লাগছে না'র উত্তরে সৌমিত্র বলেছিলেন, 'কেন মনে নেই, বুড়োর রোলগুলো করতে হবে না? কোত্থেকে হবে, এখন থেকেই ভাল না লাগলে? তুমি আর আমি বুড়ো না হলে ইন্ডাস্ট্রিতে ভাল বুড়ো পাওয়া যাবে না!'[৪] ভাল বুড়োর রোল আর করতে হয়নি উত্তমকুমারের। তার আগেই ২৪শে জুলাই ১৯৮০ সালে মাত্র ৫৩বছর বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বহু দূরে চলে গেলেন।

চলচ্চিত্র-জীবনের শেষদিকের আর একটি ঘটনা উত্তমকুমারকে খুব আহত করেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল একজন ডিরেক্টরের সঙ্গে। সৌমিত্রবাবু ডিরেক্টরের নাম বলেননি। তিনি জানাচ্ছেন, 'একজন ডিরেক্টরের ছবিতে কাজ করছি। তিনি ওঁকে একটা জিনিস করতে বলছেন। সেটা ওঁর পছন্দ হচ্ছে না। উনি বলছেন, 'না, এটা হয় না। লজিক্যালি এটা হয় না।' সত্যি, উনি(উত্তমকুমার) যেটা বলছিলেন, সেটাই ঠিক, অভিনয়ের দিক থেকে। আর যে ডিরেক্টরের ছবি, তিনি অত্যন্ত খাটো। তাঁর বোধ আর উত্তমকুমারের বোধের অনেক তফাত। তখন তিনি তাঁর ডিরেক্টরসুলভ অথরিটিটা প্রয়োগ করে বললেন, 'না উত্তমদা। আপনি যখন নিজের ছবি করবেন, তখন এসব করবেন। আমার যা ইচ্ছে, এখন তাই করতে হবে।'[৫] সৌমিত্র জানিয়েছেন যে এই ঘটনায় উত্তমকুমার অত্যন্ত দু:খ পেয়েছিলেন। কিন্তু দু:খ পেয়েও কাজটা বন্ধ করে দিতে পারেননি।

উত্তমকুমার স্টার হিসেবে যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা অভূতপূর্ব। কিন্তু সেইটেই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল অভিনয় দক্ষতার উচ্চতা পরিমাপের ক্ষেত্রে। 'তারকা'র অবিস্মরণীয় জনপ্রিয়তা ঢেকে দিয়েছিল উত্তুঙ্গ অভিনয়-দক্ষতাকে। তিনি যে কত উচ্চমানের অভিনেতা ছিলেন তার যথার্থ বিশ্লেষণ হয়নি। ৩ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। জন্মশতবর্ষে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের অগ্রগতি ও প্রসারে নিশ্চয়ই তা বিশ্লেষণ করবেন চলচ্চিত্রের বিদ্বজ্জনেরা।

তথ্যসূত্র:
১. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, অগ্রপথিকেরা, আজকাল, আগস্ট ২০১০, পৃষ্ঠা - ১৭৬
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৫
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৭

আকর্ষণীয় খবর দেখতে নজরে রাখুন ***গ্রামবাংলার খবর অনলাইন***

grambanglarkhabar.com

গ্রামবাংলার খবর ফেসবুক পেজ, grambanglarkhabar ইউটিউব ফলো করুন।

এভাবেও বাঁচতে হয়

গৌরাঙ্গ দাস

অবশেষে মদনবাবু ফিরে এলেন ঘরে। সুখা যা বলল, আলোর দেখা পেলেন না। বরং সুখার সব কথা মদন বাবুকে বিমর্ষ করে তুলল। ভাবতেই পারছিলেন না অস্থায়ী কর্মী! মাসিক ছয় হাজার বেতন! সে বেতনও ছয় মাসের বাকি! হাজার অনুরোধ, হাজার অসুবিধার কথা জানিয়েও কোন কাজ হয়নি! একটাই কথা বলেছেন পৌরসভার ম্যানেজমেন্ট, টাকা আসলেই পেয়ে যাবে। আবার এ কথাও কোন কোন উঁচু স্তরের বাবুরা বলেছেন- বেশি ঘ্যান ঘ্যান করলে ছাঁটাই করে দেবো।

অভাব কোন বাঁধা মানতে চায় না। এজন্যই নিজেদের কর্মজীবনকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ ছাটাই হয়ে যাই যাব, এই মানসিকতা নিয়ে বীরপুর পৌরসভার চারশো কর্মী প্রতিবাদের সোচ্চার হয়েছিল। সেই প্রতিবাদের সময় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরা এসে , সে প্রতিবাদের প্রতিবেদনকে সম্প্রচারিত করেছিল তাদের বিভিন্ন চ্যানেলে। অবশেষে চেয়ারম্যান কথা দিয়েছেন সাত দিনের মধ্যে বকেয়া মিটিয়ে দেবেন। অস্থায়ী কর্মীদের ফান্ডে টাকা না এলেও অন্য ফান্ডের থেকে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। অসহায় কর্মীরা এক আশার আলোর কাছে মাথা নত করে আনন্দে ফিরে গিয়েছিল যার যার আস্তানায়।

ঘটনাটা গত পরশু। সুখার কাছে মদন বাবু এ ঘটনা শুনেছিলেন। সুখাকে প্রশ্ন করেছিলেন তোমরা যারা অস্থায়ী কর্মী , সবাই এই আন্দোলনে হাজির হয়েছিলে? সুখা বলেছিল চারশো জন না এলেও - প্রায় সবাই এসেছিল। আচ্ছা তুমি সপ্তপল্লী বাড়ি, রতন মালাকারকে দেখেছিলে, তোমাদের প্রতিবাদ সভায়? প্রশ্ন করেছিলেন মদন বাবু। সুখা বলেছিল- না, ও নামে আমি কাউকে চিনি না। সুতরাং এসেছিল কিনা বলতে পারছি না। মদনবাবু বলেছিলেন - বেশ লম্বা ফর্সা মাথায় কোঁকড়ানো চুল চোখে চশমা। এমন দেখতে রতন। রতন আমাদের পাড়ায় ,তুমি আসবার আগে,তোমারি মতো - ময়লার গাড়ি টানতো।

- চিনতে পারছি না । তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি, কোন ওয়ার্ডের,কোন পার্টে আছে জানবার। আশা করি আমাদের ইনচার্জ ছেলেটি বলতে পারবেন। বলল সুখা।

- তোমাদের ইনচার্জ কি অস্থায়ী কর্মী?

- জানিনা ঠিক। তবে মাসের শেষে যখন আমাদের মত মানুষের কাছে হাত পাতে, তাতে করে আশা করা যায় - কম মাইনের কর্মী। মনে হয় আমাদের মত,তবে লেখাপড়া জানা ছেলে,কথাবার্তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়। খুব ভদ্র।

সুখা এবার মদন বাবুকে পাল্টা প্রশ্ন করল, রতন মালাকারকে কেনো খুঁজছেন ?

- খুঁজছি এজন্যই, ছেলেটাকে আমার ভীষণ ভালো লাগতো। বেশ ছিল ওর কথাবার্তা। মাঝে মাঝে ময়লা নিতে এলে ওকে আমি চা খাওয়াতাম। একটা আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। এই জায়গা থেকেই তোমার কাছে ওর খবরটা জানতে চাইছি।

- এই ব্যাপার। আচ্ছা,আজ তাহলে চলি দাদা,এখনো অনেকগুলো বাড়ি যেতে হবে। তাছাড়া কাল রাতে ঘুম হয়নি দুশ্চিন্তায়। চারিদিকে দেনায় দেনায় জর্জরিত হয়ে আছি। মুদি দোকানে আজ দুহাজার দিতেই হবে। কথা বলে রেখেছি আমাদের পাড়ায় ইন্টারেস্টের ব্যবসা করে কালু,ওর সঙ্গে। বারোটার মধ্যে যেতে বলেছে,টাকাটা আনতে, দেরি করা যাবে না। চলি দাদা, আগামীকাল কথা হবে।

সুখা চলে গেল। মদন বাবু ফিরে এলেন ঘরে। সোফায় বসে দৈনিকের পৃষ্ঠাটা খুলে চোখের সামনে মেলে রাখলেন,অবশ্য - মন সুখার কথায়...। ছয় মাস বেতন হয় না! মুদি দোকানের জন্য দুই হাজার টাকা সুদে নিতে হচ্ছে! সমাজের সবথেকে নিকৃষ্ট মর্যাদার কাজ করেও বেতনের অনিশ্চয়তা! মদনবাবু পেপারটা ভাঁজ করে রেখে দিলেন। ঠাকুর ঘর থেকে ঘন্টার শব্দ ভেসে আসছে। মদন বাবুর স্ত্রী প্রমীলা দেবী ঠাকুর সেবায় আছেন। মদন বাবু মনে মনে বললেন- প্রমিলা,তুমি পৌরসভার ময়লা নেওয়া মানুষগুলোর জন্য ঠাকুরের কাছে একবার প্রার্থনা করো। বড় অসহায় ওরা। ছয় হাজার টাকা মাত্র মাইনে, সেটাকাটাও ছয় মাস ধরে পাচ্ছে না। সুদে টাকা নিতে হচ্ছে মুদি দোকানের দেনা দেবার জন্য, মানে খিদে নিবারণের জন্য।

মদন বাবু কিচেনে গেলেন। চা তৈরীর জন্য জল বসিয়ে দিলেন সচপেনে। প্রমিলাদেবী এখনো ঠাকুর ঘরে। আজ একটু বেশি সময় নিচ্ছেন । মদন বাবু মনে মনে বললেন, যতই তুমি ঠাকুর পূজো দাও, বিপদে পড়লে তোমার ঠাকুরকে পাশে পাবে না। যেমন পৌরসভার ময়লা ডিপার্টমেন্টের চারশ জন কর্মীরা এই দুঃসময়ে,ঠাকুর আল্লাহ কেউ ওদের পাশে দাঁড়ায়নি।

চায়ের জল ফুটে গেছে। চা পাতা দিয়ে ঢেকে দিলেন সচপেনটা। গ্যাস নিভিয়ে দিলেন। প্রমীলা দেবী ঠাকুর ঘর থেকে সোজা রান্নাঘরে এসে মদন বাবুকে প্রশ্ন করলেন - অনেক সময় নিয়ে পৌরসভার ময়লা নেওয়ার ছেলেটার সঙ্গে কথা বললে , রতনের খবর কিছু পেলে?

- না। বললেন মদন বাবু।

- তাহলে আর দেখতে হবে না, তোমার তিন হাজার চোট।

- গেলে আর কি করা যাবে! তার থেকেও বড় কথা কি জানো? ময়লা নেওয়া মানুষগুলো বড্ড অসহায়। এই যে ছেলেটা এখন ময়লা নেয় ও যা বলল, তাতে করে ভীষণ কষ্ট হয়, ওদের সমস্যার কথা শুনলে। রতন যদি এই মুহূর্তে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়,আমি ওর কাছে টাকাতো চাইবোই না। বরং ডেকে নিয়ে যাব মুদি দোকানে। সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনে দিয়ে বলব - বাড়ি যা।

প্রমিলা দেবী মদন বাবুর চোখে চোখ রাখলেন। মদনবাবু বললেন - চলো চা খেতে খেতে সুখার বলা কথাগুলো তোমাকে বলবো।

শুনলে তুমি বুঝতে পারবে কি কষ্টের মধ্যে ময়লা নেওয়া মানুষ গুলো আজ দিন পার করছে।

২

মদনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায়। সুখার জন্য। যদি রতনের খবর পান। সুখা এল। দুর্ভাগ্য। রতনের কোনও খবর ও দিতে পারল না। কারণ ইনচার্জ আজ ছুটিতে আছে। মদন বাবু সুখাকে চা খাবার কথা বললেন। সুখা দেরি হবার জন্য রাজি হলো না। বলল- গতকাল দেরি হওয়াতে দুই হাজার টাকাটা হাতে পাইনি। আজ এতোটুকু দেরি করা যাবে না। মদনবাবু বললেন ঠিক আছে, তা সুখা, ওই যে দুহাজার নেবে মাসে ইন্টারেস্ট কত দিতে হবে? সুখা জানায় -মাসে দশ পার্সেন্ট করে দুইশ টাকা। আচ্ছা আমি আসি, আর দেরি করবো না, আগামীকাল আপনাকে রতনের খবর দেবার চেষ্টা করব।

মদন বাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। দশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট! ধীরে ধীরে ঘরে এলেন। ভাবলেন এই সুদে টাকা লাগানো মানুষগুলো অসহায় মানুষদের উপকারের নামে শোষণ করছে, তীব্র মাত্রায়।

মদন বাবু রোজ সন্ধ্যায়, মেহনতি মানুষের পার্টি অফিসে গিয়ে বসেন। যদিও এ পার্টির এখন ভীষণ মাত্রায় ভাটার সময় চলছে। তবুও মদন বাবুর বয়সের আশেপাশের বয়সী কজন রোজ সন্ধ্যায় পার্টি অফিসে বসেন। আড্ডার সঙ্গে বর্তমান রাজ্য ও রাষ্ট্রের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেন। এই যে এস আই আর হয়ে গেল, তা নিয়ে মদন বাবুরা জনাদশেক মিলে একটা মিছিল করেছিলেন। প্রতিবাদ মিছিল। আজ মদন বাবু বিধানসভার ভোট নিয়ে আলোচনা করছেন। যুক্তির মধ্যে দিয়ে মদনবাবু বোঝালেন এবার বাম শূন্য হবে না। একটা কী দুটো বিধানসভা অবশ্যই পাবে।

মদন বাবুর ফোনটা বেজে উঠলো। দেখলেন রাত আটটা অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। আর সেজন্যই প্রমিলা ফোন করেছে। মদনবাবু ফোনটা রিসিভ করে, ফিরছেন জানালেন। এ কথা শেষে আড্ডার সকলেই একে একে যার যার বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

মদন বাবু বাড়ি ঢুকতেই প্রমীলা দেবী অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কেননা রাত আটটার ওষুধ দুটো খেতে লেট হবার জন্য। মদনবাবু বললেন একদিন আধাঘন্টা ওষুধ খেতে লেট হলে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না।

- সে কথা হয়তো ঠিক। আসল কথা হল সময়কে গুরুত্ব না দিলে একদিন এক সময় দেখবে ভীষণ অনিয়মের মধ্যে পৌঁছে গেছো। আর বিপদ এসে তোমাকে আপন করে নিচ্ছে। সুতরাং কোনও কিছুতেই নেগলেজেন্সি করা ঠিক নয়। বললেন প্রমীলা দেবী।

৩

রাতে বোধহয় ঠিকমত ঘুম হয়নি মদন বাবুর। সেজন্যই আজ অন্যদিনের মতো ভোরে ঘুম ভাঙ্গেনি। সুখা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রমিলাদেবীকে পেয়ে জানাল রতনের খবর আছে। প্রমীলা দেবী সুখাকে বারান্দায় বসতে বললেন। তারপর ডাকলেন মদন বাবুকে। রতনের খবর আছে শুনে মদনবাবু চোখে মুখে কোনও রকমে জলের ঝাপটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তত সময় প্রমীলা দেবী সুখার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন চা। বলেছেন খেয়ে নাও ভাই। মদন বাবু সুখার সামনাসামনি চেয়ারটা টেনে বসলেন। বললেন বলো সুখা, কি খবর নিয়ে এসেছো? মাথা নিচু করে সুখা বললো খবরটা ভালো নয়, এমন খবর এই সকালবেলায় কাউকে না দেওয়াই ভালো। কিন্তু আমি তো বিকালে বা সন্ধ্যায় আসতে পারবো না, কেননা পারটাইম আমি একটা কাজ নিয়েছি। সেজন্যই খবরটা এখন আপনাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানিয়ে যাচ্ছি।

- মদন বাবু বললেন - তুমি তো সত্যিটাই বলবে। আর সত্যিটা আমাদের সকলকেই মেনে নিতে হয়। তুমি বলো, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি দুঃসংবাদ শোনাবে। কিভাবে কি ঘটলো একবার বল।

সুখা মাথা নিচু করে বলে চলল - দীর্ঘদিন পৌরসভা থেকে বেতন না পাওয়ার জন্য ও অনেক টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল। ওদের পাড়ার এক সুদের কারবারি থেকে টাকা নিয়েছিল দশ হাজার। তিন মাসের ইন্টারেস্ট বাকি পড়ে গিয়েছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই কারবারি, রতনদার বাড়িতে এসে হুজ্জতি করে। রতনদাকে ভীষণভাবে মারে , বৌদি ও ছোট্ট মেয়েটার গায়েও হাত তোলে। সেই দুঃখ থেকে সম্ভবত রতনতা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন । কিছু সময় নীরব থেকে সুখা আবার বলে - আমিও খুব চিন্তায় পড়ে গেছি। মাইনেটা সময়মত না পেলে সুদের টাকা কিভাবে শোধ করব?

সুখা বিষন্ন মন নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। প্রমীলা দেবী বলেন - আর এক মিনিট বসো ভাই। প্রমীলা দেবী ঘর থেকে ফিরে এসে সুখার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলেন - এই টাকা থেকে আজই সুদের টাকা শোধ করবে। আমাকে ফেরত দেওয়া নিয়ে ভেবনা। পারলে দেবে, না দিতে পারলেও কোনও অসুবিধা নেই। মনে কর তোমার দিদি, তোমার বিপদের দিনে, তোমার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমার কর্তার আর একজন প্রিয় হয়ে ওঠা পৌরসভার ময়লাটানা মানুষকে, আমি বিপদে পড়তে দেব না। প্রমীলাদেবী একটু থেমে থেকে, আবার প্রশ্ন করলেন- তা ভাই রতনের পরিবারের এখন কি অবস্থা?

- বৌদিকে পৌরসভা একটা কাজ দিয়েছে। ভালো না থাকতে পারলেও বেঁচে থাকতে পারবে, নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষটা।

মদনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুখাকে বললেন - রোজ সকালে কাজে বেরিয়ে আমার এখানে বসে এক কাপ চা খেয়ে যাবে ভাই। আর কোনও অসুবিধায় পড়লে আমাকে জানাবে। মনে রেখো আজ থেকে তুমি একজন দিদি পেয়েছ, পেয়েছ একজন দাদাকে।

সুখা ওর ফ্যাকাসে মুখে আলো আনার চেষ্টা করেও পারল না। চোখ ভিজে উঠেছিল ওর। ভেজা গলায় বলল—আজ তাহলে আসি দিদি, আগামীকাল আবার চা খেতে আসবো দাদা।

মধুরেণ সমাপয়েৎ

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

আষাঢ় মাস। বৃষ্টি হলেও গরম কমছে না। দিনকাল পাল্টাচ্ছে। সেই সাথে গরমের ধরনটাও কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে দিন দিন। ভ্যাপসা ভাব । সেদিন প্যাসেঞ্জাররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ছে, তাই এই অবস্থা। দিগম্বর টোটো চালাতে চালাতে কত কথাই শোনে ;এক কান দিয়ে শোনে আরেক কান দিয়ে বের করে ে। কিন্তু ভুক্তভোগী আর গরমের কষ্টের জন্যই বোধহয় এ কথাটা মনে আছে।

সত্যি বলতে কি, মনে রাখার মত অবস্থাও ওর এখন নেই । মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। সরকার পাল্টাবার সাথে সাথেই সবার আগে টোটোআলারা রাতারাতি ভোল পাল্টে ফেলেছে । সবাই এখন বড়ফুল। আগে যারা একটু অন্যদলের ছিল ,তাদের উপর বাড়ছে চাপ। দিগম্বর এর উপরও চাপ আছে। লাইনেই ঢুকতে দিচ্ছে না। রুটি রুজি বন্ধ হলে খাবে কি। তাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, ভোল পাল্টাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ,কোন মতে আবার লাইনে মাথা গলাতে পেরেছে । এদিকে সরকারি ফতোয়া বেরিয়েছে ---- বড় রাস্তায় টোটো নিয়ে যাওয়া যাবে না।তা নিয়ে চলছে ধুন্ধুমার। কি যে হবে কে জানে । চারিদিকে শুধু ঝামেলা আর ঝামেলা ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে বিড়িতে টান দেয় দিগম্বর। মনটাই সকাল থেকে খিচরে আছে। বাইরে এক জ্বালা, তো ঘরে আর এক। আজ ভোররাতে ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় একটু কাছে টেনে নিতে গিয়েছিল সোহাগীকে। আর যাবে কোথায়; বিড়ালের মত ফ্যাচ করে উঠে সোহাগী বলে,—'আদরের আর শেষ নেই। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তবু রসের কমতি নেই। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাতে একটু ঘুমোবারও জো নেই।' ঠেলা মেরে তাকে দূরে সরিয়ে, নিজে ছিটকে সরে যায় সোহাগী।

এসব সহ্য হয় ? বয়স হয়েছে বলে কি সব জলাঞ্জলি দিতে হবে? বুঝি চার-পাঁচ বাড়ির

ঠিকে কাজ, তারপর সারা বাড়ির কাজ; সবই করে এক হাতে। তবু দিগম্বর এর যত্নের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি নেই। শুধু একটু কাছে টানতে গেলেই বিপত্তি। একটু কাছে আসলে কি হয়? গরম মেজাজের সাথে এই হতাশ প্রশ্নটা আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল দিগম্বর। তারপর দেরি করে উঠে বিড়ির ধোঁয়ার দিকে উদাস ভাবে চেয়ে এসব কথাই ভাবতে থাকে দিগম্বর।

এর মধ্যে কখন উঠে সোহাগী যে তার কাজে বেরিয়ে গেছে, তা জানেনা দিগম্বর। কিন্তু তার জন্য জলখাবার রেডি করে দিয়ে যেতে ভোলে নি । মুখ হাত ধুয়ে জল খাবার খেয়ে টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দিগম্বর। স্ট্যান্ডে পৌঁছে এক কাপ লিকার চা খেয়ে, বিড়িটা ধরিয়ে সবে জুত করে টোটোয় বসেছে; এমন সময় এক মহিলা এসে হাজির। সালোয়ার কামিজ পরা, বেশ সুন্দরী। তবে মুখের খানিকটা ওড়নায় ঢাকা। কাছে এসে বললেন,—

—'কি, যাবেন তো'?

বললাম, —হ্যাঁ, কোথায় যাবেন?

—'প্রথমে যাব জিওলডাঙ্গা। তারপর যেখানে যেখানে বলবো , যেতে হবে। ঘন্টা চারেক আমার সাথে থাকতে হবে। কত দিতে হবে সেটা বলুন'।

জিওলডাঙ্গা তো বেশি দূরে নয়। আর চার ঘন্টা যদি ওনার সাথে থাকতে হয়,তাহলে ঘন্টা পিছু একশ টাকা ধরলেও চারশো। এসব মনে মনে ভেবে নিয়ে একটু বাড়িয়েই বলি,—

—'পাঁচশো দেবেন।'

মহিলা এক কথায় রাজি। উনি টোটোয় উঠে বসতেই আমি স্টার্ট দিলাম। প্রথম গন্তব্য জিওলডাঙ্গা।

রাস্তার পাশে একটা বাড়ির সামনে উনি টোটো থামাতে বললেন। নেমে উনি চলে গেলেন বাড়ির সামনে। পরক্ষণে ফিরে এসে বললেন,

—'না:, বাড়িতে নেই। চলুন, যেদিক দিয়ে আসলেন সেদিকেই চলুন; মানে ওই স্ট্যান্ড এর দিকেই চলুন।'

আমি আর বাক্যব্যয় না করে টোটো স্টার্ট দিলাম । টোটোয় বসে উনি নিজের মনেই বলতে লাগলেন—'বলল, ব্যবসা করবে। নিজের সামান্য জমি যেটুকু ছিল, তাই বেচে টাকা দিলাম; আর এখন ফোন ধরছে না।'

আমি আর কি বলবো, চুপ করে আছি। উনি আবার ফোন করতে লাগলেন। তারপরই হতাশ কণ্ঠে বলেন—'ধরছে না'।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। টোটো ছুটছে আপন গতিতে। হঠাৎ মহিলা চেঁচিয়ে ওঠেন,—'ওই তো যাচ্ছে! ওই তো স্কুটিতে করে যাচ্ছে! নীল শার্ট পরা। ভাই, একটু তাড়াতাড়ি চলুন না ভাই, যদি ধরা যায়'।

আমার টোটোর নতুন ব্যাটারি; গাড়িটার স্পিডও ভালো। সুতরাং জোরে চালিয়ে স্কুটিটাকে ওভারটেক করে সামনে গিয়ে দাঁড়াই। লোকটি ব্রেক কষে স্কুটি দাঁড় করিয়ে আমাকে গালাগালি দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই মহিলাটি নেমে লোকটির সামনে গিয়ে বলে,—'কি ব্যাপার! এতবার ফোন করছি, ফোন ধরছো না কেন?'

ঝাঁজিয়ে উঠে লোকটি বলে, —'স্কুটি চালাচ্ছিলাম, দেখতে পাচ্ছ না; ধরবো কি করে'।

জিন্সের প্যান্ট, নীল শার্ট—দেখতে বেশ ভালই লোকটা। এরপর ওদের মধ্যে কি কথা হলো জানি না। মহিলা আমার কাছে এসে বলল,—'আমার আর টোটো লাগবে না। এই নিন আপনার পাঁচশো টাকা। ঠিক আছে তো'।

চার ঘন্টার জায়গায় মাত্র কুড়ি মিনিটে পাঁচশ টাকা, আমার আর কি বলার থাকবে। এমনিতেই মনটা ফুর ফুর করছে। আজ আর না; টোটো ঘুরিয়ে বাড়ির পথ ধরি। তখন কি আর জানি কপালে শনি নাচছে ।

কদিন পরে দেখি সোহাগী বলছে,—'কি হলো, শুনছি নাকি সুন্দরী মেয়ে নিয়ে টোটো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কই, বলোনি তো?'

বুঝলাম স্ট্যান্ড এর কোনো বান্ধব জায়গামতো লাগিয়ে দিয়ে গেছে। বিষয়টা হালকা করার জন্য হাসতে হাসতে বলি,'সকালবেলাতেই কড় কড়ে পাঁচশ টাকা, তাও মাত্র কুড়ি মিনিটে, কে ছাড়ে বলতো। তাছাড়া তুমি তো আজকাল কাছে ঘেষতেই দাও না'।

—'ওমনি শুরু হয়ে গেল তাই না?' বলে এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট বিস্কুট হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যায় সোহাগী। এমন সময় টোটো চালায় এক বন্ধু বিশু এসে হাজির। মুখের দিকে তাকিয়ে বিশু জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, তুই কি কোন মহিলাকে এর মাঝে গাড়িতে তুলেছিলি? তার ডেড বডি নাকি কোন পুকুরে পাওয়া গেছে । পুলিশ স্ট্যান্ডে এসে তোর খোঁজ করছিল। বলে গেল, তোর সাথে দেখা হলে যেন তোকে থানায় যাওয়ার কথা বলি। তাই তো ছুটতে ছুটতে এলাম। যা—একবার ঘুরে আয় থানা থেকে। দেখ কি বলে। আমার আবার প্যাসেঞ্জার আছে, আমি চললাম রে। যদি কোন দরকার হয় তো বলিস'। আর দাঁড়ায় না বিশু।

থম মেরে বসে থাকে দিগম্বর। একেই চারিদিকে নানান ঝামেলা, তারপরে এই নতুন তাল। সারা জীবন শুনে এসেছে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে না জানি কত ঘা। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে দিগম্বরের।

তাকে এরকম ঝিম মেরে বসে থাকতে দেখে সোহাগী বলে ওঠে,

—'কি হলো স্ট্যান্ডে গেলে না?'

—'যাব আর কি করে। এইমাত্র বিশু এসে বলে গেল সেদিন যে মহিলা আমার টোটোয় উঠেছিল, সে খুন হয়েছে। পুলিশ আমায় দেখা করতে বলেছে। কি হবে শেষ পর্যন্ত কে জানে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে দিগম্বর।

চিন্তিত মুখে সোহাগী বলে, 'দেখা যখন করতে বলেছে তখন যেতে তো হবেই; দেরি করে আর কি লাভ। তুমি যাও ঘুরেই এসো। আমি এর মধ্যে ঠিকে কাজটা সেরে আসি। আর হ্যাঁ, তুমি কিন্তু থানা থেকে সোজা বাড়ি আসবে; মনে থাকে যেন।

মুখ কালো করে এগোয় দিগম্বর। আকাশও তার মুখের মত কালো হয়ে উঠেছে। যা ভ্যাপসা গরম, বৃষ্টি আসবে কিনা কে জানে। এসব ভাবতে ভাবতে টোটো স্টার্ট করে দিগম্বর। সোজা থানা।

থানায় পরিচিত এক সিভিক পুলিশের সাথে দেখা। তাকে সব কথা বলতেই, থানার মেজো বাবুর সাথে দেখা করিয়ে দিল সে। খানিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করার পর মেজোবাবু আমার নাম, ধাম একটা খাতায় লিখে আমায় একটা ফটো দেখিয়ে বললেন ,—'দেখো তো, এই মহিলাই কি তোমার টোটোয় উঠেছিলেন?' আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাবার পর উনি আবার বললেন,—'তারপর, তারপর কি হলো?

তখন আমি মহিলার টোটোয় ওঠা, একটা বাড়ির সামনে নামা, এমনকি চার ঘন্টা চুক্তি থাকা সত্ত্বেও মাত্র কুড়ি মিনিটেই ৫০০ টাকা দিয়ে এক ভদ্রলোকের সাথে কোথায় যেন চলে যাওয়া, এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে ফেলি। সব শুনে মেজোবাবু বললেন,-—'আচ্ছা দিগম্বর, যে বাড়িতে ওই মহিলা নেমেছিল সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। আর তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই, ওই মহিলা খুন হয়েছেন। আর একটা পুকুরে তার লাশ পাওয়া গেছে। এবার আমাদের সাথে চলো বাড়িটা চিনিয়ে দেবে'।

অগত্যা টোটো থানায় রেখে পুলিশের গাড়িতেই যেতে হল। বাড়ি চিনিয়ে দিয়েও নিষ্কৃতি মিলল না। 'আগামী কাল এই সময়ে থানায় একবার এসো'—বললেন মেজোবাবু।

কি আর করা, টোটো নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয় দিগম্বর। সারাদিনটাই প্রায় মাটি। টাকা পয়সার কোন আমদানি নেই; কতদিন এরকম থানায় যেতে হবে কে জানে—ভাবতে ভাবতে বাড়িতে চলে আসে দিগম্বর। ছুটে এসে সোহাগী জিজ্ঞাসা করে,—'কি হলো?'

—'এমনি, সব জানলো। খারাপ ব্যবহার কিছু করেনি। শুধু যেখানে উনি নেমেছিল, সেই বাড়িটায় নিয়ে যেতে হল। আবার কালকে যেতে হবে থানায়।' —বলে চুপ করে যায় দিগম্বর।

পরদিন আবার থানায়। মেজ বাবু বললেন —'আমরা একজনকে পাকড়াও করেছি, বুঝলে। তুমি একবার দেখো তো, যার সাথে মহিলা দেখা করেছিল সে এই লোকটা কিনা। এই যাও লকআপ থেকে নিয়ে এসো তো ওকে'। একজন পুলিশকে অর্ডার দেন মেজবাবু।

একটু বাদেই দেখি কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে আমাদের সামনে নিয়ে আসলো লোকটাকে। খুনের আসামি বলেই হয়তো এই সতর্কতা। আমি লোকটিকে ভালো করে দেখে, ঘাড় নাড়িয়ে বললাম—'হ্যাঁ, এই'। লোকটিকে নিয়ে গেল। এবার মেজোবাবু আমাকে বললেন, —'আর তোমাকে আসতে হবে না দিগম্বর। যদি প্রয়োজন হয়, তবে তোমাকে একবার কোর্টে গিয়ে লোকটিকে শনাক্ত করে আসতে হবে। সে তখন আমি তোমায় খবর দেবো। এখন তুমি যেতে পারো।'

হাঁফ ছাড়ে দিগম্বর। এখন সোজা বাড়ি; সোহাগী চিন্তা করছে। টোটো স্টার্ট করে স্পিড তোলে দিগম্বর। এইমাত্র শেষ ঠিকে কাজটা শেষ করে বাড়ি ফিরেছে সোহাগী। দরজার কাছে টোটোর শব্দ হতেই ছুটে আসে সোহাগী। দিগম্বর ঢুকতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় সোহাগী। আজ আর কোন লোক মানামানি নেই, কোন ঢাকাঢাকি নেই, দিগম্বর ছুটে এসে সোহাগীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলে, —'সব মিটে গেছে। খুনি ধরা পড়েছে। আমারও রেহাই। সব উদ্বেগের শেষ।

ওদের দুজনের মুখেই তখন চিকচিকে হাসি। আকাশে কালো মেঘের পরিবর্তে সাদা মেঘের ভেলা।

বাগদা, গলদা চিংড়ি ও এক কবির গল্প

বিবর দত্ত

প্রকৃতির খেয়াল দেখছি লাগামছাড়া। আবহাওয়ার হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ। তো বৃষ্টির শুরু উত্তরবঙ্গের আকাশ প্রথম ঝড়-বৃষ্টি দেখিয়েছে। এ বছর ২০২৬ সালের কথা বলছি। দেশ জুড়ে যেমন নিত্য পণ্যের দাম বাড়ছে, তেমনি বর্তমান দেশ চালকেরা গদি টিকিয়ে রাখার ইচ্ছেও প্রকাশ করছে। অন্যদিকে বিরোধী বা কারা দেশ চালাবে, কারা সে দায়িত্ব পালন করবে এ ভাবনা নিয়ে দু-দলের লড়াইটা বেশ জমে উঠেছে। দেশ দখলের চেষ্টায় দেদার অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে স্বদেশীকতার ও ধর্ম বিভাজনের পথ প্রদর্শন করছে। যারা দেশ চালাচ্ছিল তারা তো দায়িত্ব পাওয়ার শুরুর সময়ে কিছু ভগ্ন দুর্দশাগ্রস্ত কাজকে চালাতে চালতে ব্যক্তিগত আখের গোছাচ্ছিল। সব দেখে শুনে কবি প্রলয় চক্রবর্তী আরে—ঐ যে কালিকাপুরের কবি প্রলয় ওর কথা বলছি। বিশ্বের দিকে দিকে চলছে যুদ্ধ। ইজরায়েল, গাজা, ইরান, ইরাক তীব্র আধুনিক অস্ত্রের আগুন গোলা নিক্ষেপে ধ্বংসলীলা দেখাচ্ছে। নানা বৃহৎ প্রয়োজনীয় সরকারি দপ্তরগুলোর ধ্বংসের চেষ্টা বেসরকারীর মানুষ ঘর-বাড়ি, শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরগুলির ক্ষতি হচ্ছে। জলে পড়া মোবাইলটা রিপেয়ারিং দোকান থেকে সারিয়ে প্রলয় যে ফেসবুকের স্ক্রিনে দেখল, নেপালে হড়পা বাণের তোড়ে কাগজের নৌকোর মতো পাকা ঘরবাড়ি ভেসে চলেছে। কত গাড়ি ভেঙে পড়েছে, কত মন্দির টন্দির, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের বিভিন্ন অংশ—মানুষ, গাবদি পশুও বাদ যায়নি। এ কি ধ্বংসলীলা শুরু! এই ধ্বংসলীলার মাঝেই আকাশপথে নেমে আসবেন ঈশ্বরপুত্র যীশু। শোনা যায় ঈশ্বর নাকি তাকে পাপকর্মে লিপ্ত থাকা মানুষদের শোধরাতে পাঠিয়েছিল। এ ধরায়। তো পাপীরা তাকে নির্মমভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল। আপাত মরলেও তিনদিনের মাথায় জীবন্ত হয়ে পুনররুত্থান হয়েছিল যীশুর। কবি প্রলয় এত কাল এসব ঘটনার ওপর অনেক কবিতা লিখেছেন। তার কবিতা পড়ে কেউ ভালো কেউ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় বলেছেন। কিন্তু প্রলয়ের ঘরণী সুমিত্রা আবার ভিন্ন মত মত বলেছে এই লেখালেখি চললে তুমি সংসার ছাড়ো।

কেন?

—সেদিন প্রশ্ন করেছিল প্রলয়।

—মানুষ পাত্তা দেবে না।

—তাহলে?

পাত্তা পেতে গেলে যারা দেশ চালাচ্ছে। তাদের ঝান্ডা ধরো।

মিছিল মিটিংএ যোগ দাও, দেখবে অটোমেটিক্যালি নেতা বনে যাবে তুমি।

হেসেছিল মনে মনে কবি প্রলয়।

তার দ্বারা যে অমনটা করা হবে না সেটা সে সুমিত্রাকে স্পষ্ট জানিয়েছিল। কবি জায়া সুমিত্রা সেই থেকে সুর চড়িয়েছিল। ইচ্ছাকৃত টানাপোড়েনের কথা বলত। এটা নেই, ওটা নেই, কী করব, না খেয়ে কতদিন থাকা যায়, ধার কে দেবে আমায়, তার চেয়ে আমি নিজের পেটের ধান্দা করব। তুমিও যা ইচ্ছে করো কিন্তু এখানে নয়, ঘরের বাইরে গিয়ে।

একদিন শ্রাবণ মাসের ঝর্নাধারা বৃষ্টির মধ্যে কবি প্রলয় পলিথিন প্যাকেট মাথায় টুপির মতো করে বের হল। শূন্য দু'হাত মাঝে মাঝে মুঠো হয়। এটা কি শক্তি সঞ্চয়? মানসিক শক্তির আগমন কি এভাবেই ঘটে মানুষের দেহ ও মনে।

কবি প্রলয় খড়িবেড়িয়া মৎস্য আড়তের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে এক মৎস্য ব্যবসায়ী ডাকল—এই যে ভাই কোথায় চললেন?

কেন বলুন তো? আপনি কি আমায় চেনেন?

না না, চিনি না। দেখে মনে হচ্ছে আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ। আমার না, খাতা লেখার একজন মুহুরি চাই। আপনি করবেন এ কাজ?

কবি প্রলয়ের ভেতরে ভাবনা, পারব কি হিসাব লেখাজোকা। ওপরে ভাবনা করতেই হবে। কর্মহীন জীবন কি অসহায় সে কথা তো সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। সংসারে সবাই অবহেলা অবজ্ঞা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতা দেখায়।

—তার চেষ্টা করে একবার দেখাই যাক না। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে কবি প্রলয়। মৎস্য ব্যবসায়ী বলল—বসুন। কি নাম আপনার? আমার নাম আব্দুল হালিম।

আমি প্রলয় চক্রবর্তী।

তা হল, করবেন না কী আপনি? হ্যাঁ, না বলুন। আমি আবার চিংড়ির ভেড়িতে যাব।

করব।

বেশ। এই মনসুর এই দাদাকে আমার অফিস রুমে নিয়ে যা। ওখানে বসে পুরোনো খাতাপত্র দেখুক। আমি দুপুরের আগেই এসে যাব। ও—হ্যাঁ মনসুর চারটে পরোটা, আলুর দম, ঘুগনি যা খেতে পারেন উনি এনে দে। —বলে মৎস্য ব্যবসায়ী হালিম চলে যেতে কবি প্রলয় মনসুরের সঙ্গে সঙ্গে আড়ৎ অফিসে এসে টেবিলে রাখা পুরোনো খাতাপত্র খুলতে লাগল। অশিক্ষিত হাতের লেখা দেখে বুঝে নিল—লেখা কাজের পদ্ধতি। মৎস্য ব্যবসায়ী হালিম এলে কবি প্রলয় শুরু করল আজকের দিনের লেখালেখি। তার মধ্যেই হালিম জেনে নিলেন প্রলয়ের ঘরবাড়ি আছে বটে কিন্তু সে রোজ বাড়ি যাবে না। সে আশ্রয় চায়। এ কথা বুঝে হালিম তাকে অফিস সংলগ্ন একটা ঘরে থাকতে দিল।

সে ঘরটাতে কাঠের খাট, মাদুর, পরিষ্কার চাদর বিছানো। মনে হচ্ছে নতুন চাদর। মশারিটা সন্ধের দিকে দিয়ে যাবে মনসুর।

এ কথা বলে মৎস্য ব্যবসায়ী মনসুর চলে গেলেন। কবি প্রলয়ের জীবন মঞ্চে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন পথ খুলে গেল। মৎস্য ব্যবসায়ী হালিম বলল, যা যা লাগবে বলবেন। সংকোচ করবেন না। এভাবেই প্রলয় তার সংসারের অবহেলিত হয়েও মর্যাদা ও ভালোবাসার ঘর পেয়ে গেল। মাসখানেক পেরোতে হালিম বলল—মাইনে নিন। বাড়ি যান। আর ও হ্যাঁ, মনসুরকে বলে দু-কেজি বাগদা, গলদা নিয়ে যান। বাড়ির সবাই খাবে।

প্রলয় নীরব রইল। ভেতরের পুরোনো যন্ত্রণাকে ওগরাতে চাইল না।

হালিম বলল—এক রাত থেকে ফিরবেন কিন্তু।

প্রলয় বাড়ি এসে দু-কেজি বাগদা-গলদা মাছের ব্যাগটা আগে হাত থেকে টেনে নিল সুমিত্রা। বাঃ বাঃ এত মাছ! কতদিনে খাব?

আরে পাশের দু'ঘরে কিছুটা দিয়ে দাও। ওরাও খাক। পাশের দু-ঘর মানে একজন কাঠমিস্ত্রি একজন এক দামের ফেরিওয়ালা। ভ্যানে প্লাস্টিক, জগ, মগ, সাবান ঘষা, সাবান রাখা বাক্স আরও কত কি! তাদের ঘরে দিতে বলল—প্রলয়।

না , না ওদের কেন দেব? ওরা তোমার চাইতে বেশি আয় করে। নিজেরা খেয়ে শেষ করতে না পারি কুকুর, বিড়ালকে খাওয়াব। —সুমিত্রার কথায় বেশি যোগ দিতে ইচ্ছে হল না প্রলয়ের। নীরবতাই শ্রেয় বলে ভেবে নীরব রইল সেদিন। কিন্তু দিনভর সুমিত্রা এত বাগদা গলদা আনার জন্য ভীষণ ভীষণ খুশিতে প্রলয়ের প্রতি আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। রাত কেটে ভোর হতে প্রলয় চলে এল মাছের ভেড়ির হিসেব লেখার সেই অফিসে।

এবার এখানেই এসে প্রলয় মাছের আড়ৎদার তথা মালিক আবদুল হালিমের ভেতরের একটা চেহারার কথা জানতে ও দেখতে পেল। চেহারাটা মদ ও মেয়েমানুষের নেশা। এ নেশার পরিণতি প্রলয় পুরোপুরি জানে না। তবু দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। এ কথা ভেবে প্রলয় তার কর্মে মনোনিবেশ করল।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল মাছ মালিক আড়ৎদার তার বাড়ি থেকে অফিসে আসছিল। পথে হার্টফেল হয়েছে। তড়িঘড়ি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েও কোনো লাভ হয়নি। মারা গেছে। খবরটা কানে আসতে আসতে হালিমের দুই শ্যালক এসে জানাল—অফিস বন্ধ হবে। সেরেস্তাবাবু আপনি ফিরে যান। নিঃসন্তান হালিমের একমাত্র স্ত্রীর এমনই সিদ্ধান্ত।

বাড়ি ফিরে এল প্রলয়। ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে সুমিত্রা বলল, এটা হবে জানতাম। কোথাও তোমার পাত পড়বে না। যত সব আজগুবি গল্প শোনাচ্ছ। আসলে কুড়ে লোকের যা হয়। আমাকে মেকআপ দিতে বেশ বানিয়েছ গল্পটা। পারোও তুমি মিথ্যে বলতে।

ভর্তি চলছে *ভর্তি চলছে*

এম. মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তি চলছে

স্থাপিত : ১৯৬৯

(অনুমোদিত; এম. এম. ই. সি, স্বীকৃত বোর্ড অব আই, সি, পি, এস, ই নিবন্ধকরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

সর্বনিম্ন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ মহিলাদের জন্য। বয়স: ১৮-৫৫। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী। ১ বছরের কোর্স। ক্লাশ সপ্তাহে ২ দিন। সেশন: জানুয়ারী, ডিসেম্বর, জুলাই, জুন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তে যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষকতার সুযোগ। মূল কেন্দ্র থেকে ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

এম. মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (স্থাপিত:১৯৬৯)

মূল কেন্দ্র ও গবেষণা কেন্দ্র: ৩ নং চণ্ডিগড়, মধ্যমগ্রাম বাজার, কোলকাতা-৭০০১৩০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ, মোবাইল: ৯৮৩১৮১৩০৪৭

অনুমোদিত কেন্দ্র সমূহ: ● মধ্যমগ্রাম ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী (মোঃ) ৯৮১৩৮১৩০৪৭ ● সোদপুর কেয়ার মোড়, বি-২২ স্কুল রোড, কোলকাতা-৭০০১১০, সঙ্গীতা সেন রায় (মোঃ) ৯৩৩০২৯২৯৮৬ ● বরাহনগর-কাবেরী দে (মোঃ) ৯৪৩৩৭০২২২০ ● মেদিনীপুর-তনুশ্রী গাঙ্গুলী (মোঃ) ৯৪৭৪৯৭৩০৮৪ ● হুগলি, চন্দননগর অঞ্জলী গুপ্তা (মো:) ৯৪৩৩৪৫৮২৮৬/৯৩৩৪৫৮২৮৬ ● হাওড়া-ব্যাটরা মমতা প্রামানিক (মোঃ) ৯৮৩০০৩২৩৫৭ ● বর্ধমান রূপনারায়ণপুর-বি, পি, ওঝা (মোঃ) ০৯৮০০৫৫১৯৫৮৬ ● বারাসাত- মিসেস ললিত (মো:) ১৮৩০৯৩৫৩৫৯ ● নদীয়া-কল্যাণী-গার্গি সেনগুপ্ত সাহা, (মোঃ) ৮৯০২৩৭৮৩৮০/৯০৬২২৭৯৬৬৬

চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে এম মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা।

সাতচল্লিশের স্মৃতি এবং এখন

দেবদাস চট্টোপাধ্যায়

১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট অখণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্রকে ২ (দুই) খণ্ডে ভাগ করা হয়—'পাকিস্তান' আর 'হিন্দুস্থান'। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে নিয়ে গঠন হয় পাকিস্তান (মুসলিম রাষ্ট্র)। পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলাকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা চিহ্নিত করে হয় পূর্ব পাকিস্তান। খুলনা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা বলে হিন্দুস্থানের মধ্যে ছিল।

২০০ বছরের পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সেদিনকার আনন্দ, অনুভূতি আজও মনে পড়ে। সারা রাত জেগে পাটকাঠিতে ময়দার আঠা বানিয়ে তিরঙ্গা পতাকা লাগিয়ে, পোস্টার লিখে, ভোরবেলা আমাদের বাড়ি (কাঠিপাড়া গ্রাম) থেকে রাড়ুলি গ্রাম - আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল। দাদাদের হাত ধরে জলকাদার রাস্তা দিয়ে আমিও গিয়েছিলাম। এতটাই ছোটো ছিলাম, 'বন্দেমাতরম, ভারতমাতা কি জয়, জয় হিন্দ' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে রাড়ুলি (আর.কে.বি.কে হাইস্কুল) পর্যন্ত প্রভাতফেরি পৌঁছেছিল। সে কি আনন্দ সে কি উল্লাস!

আমাদের গ্রামে তখন একটাই রেডিও, ডাঃ কালিপদ ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে। সন্ধ্যা হতে না হতে গ্রামের মানুষ জড়ো হচ্ছে। ডাক্তারবাবুর বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে মাঠে। বাড়ির দোতলার জানালায় রেডিওটা রাখা আছে। আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে ঘোষণা হচ্ছে,—'খুলনাকে ভারতের অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে দেওয়া হলো। তখনকার খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা নিয়ে খুলনা জেলা। আমাদের গ্রাম রাড়ুলি, কাঠিপাড়াও বাদ যায়নি। বড়ো হয়ে জানতে পারলাম, যদিও মুর্শিদাবাদ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, ভারতের প্রয়োজনে মুর্শিদাবাদকে হিন্দুস্থানে রেখে পরিবর্তে খুলনাকে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঐদিনই রাত্রে ভারতীয় পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উড়ানো হয়েছিল। মুসলিম ভাইরা গ্রামে গ্রামে স্লোগান দিতে দিতে হিন্দুদের বাড়ি উঠানোর উপর দিয়ে, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছে—'হিন্দু মাইয়াগোর নিকা করব, এবার আমাদের বাড়ি হিন্দুগোর দিয়া খাটাইবো। আল্লা হোয়াক্বর পাকিস্তান জিনদাবাদ' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে মিছিল এগিয়ে গেল। আমরা ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইলাম। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে তখন তিরঙ্গা পতাকা উড়ছে। কয়েকজন মুসলিম ছেলে এসে ভারতের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে দিল।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় গ্রামের ছোটো বড়ো সবাই সংবাদ শোনার জন্য ডাক্তারবাবুর বাড়ির সামনে মাঠে অপেক্ষা করতেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচারের কথা, আগুন লাগানোর কথা শোনা যাচ্ছে। গ্রামের হিন্দুরা জোট বেঁধে রাত্রে গ্রাম পাহারা দিচ্ছে। সন্ধ্যার পর বাড়ির মেয়েদের বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মুসলিম ভাইদের মধ্যে কিছু তো ভালো মানুষ আছেন গ্রামে। যারা ভরসা দিতেন—'আমরা আছি বাইরে থেকে এসে গ্রামের কোনও ক্ষতি করতে দেব না। আপনারা নির্ভয়ে থাকুন।" আমরা একসাথে যেমন ছিলাম তেমনই থাকবো' ইত্যাদি।

কিন্তু ভয় তো থেকেই যায়। নানা জায়গা থেকে খবর আসতে লাগলো—হিন্দুদের বাড়িতে অত্যাচার করছে। হুমকি দিচ্ছে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, গোয়াল থেকে গরু, ছাগল তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে পরিবারের সাথে নিরাপদে ভালোভাবে নিজের ভিটে বাড়ি, নিজের গ্রাম, নিজের দেশ ছেড়ে, এপার বাংলায় আসার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি চলতে লাগলো। সুযোগ মতো আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। নদীপথে পার হয়ে পৌঁছলাম বসিরহাটে-টাকীতে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুস্থানে।

'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
ওপারেতে স্বর্গ-সুখ আমার বিশ্বাস।।'

স্বাধীনতার পরপরই বাবা হিন্দুস্থানে চলে আসেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পি.ডব্লু.ডি. ডিপার্টামেন্ট-এ হেলথ সেন্টার বিভাগে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে (এস.ডি.ও) পোস্টিং নিয়ে বাঁকুড়ায় যান। ঠাকুমার কথা মতো হাবড়ায় জমি কিনে বাড়ি করতে হয়েছিল। ঠাকুরমার এক ছেলে এক মেয়ে, আপদে বিপদে উভয় উভয়কে দেখবে, পাশে দাঁড়াবে। বদলির চাকরি তাই হাবড়ায় ১৯৫৩-৫৪ সালে একটুকরো জমি কিনে মাথা গোঁজার মত ছোট্ট (অসমাপ্ত) বাড়ি করে আমাদের রেখে যান ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরে, কোলকাতা, মেদিনীপুর, বছরের পর বছর বাইরে থাকতে হয়েছে বাবাকে। আমাদের ভাইবোনদের পড়াশুনা, স্কুল, কলেজ সবই হাবড়ায়।

ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ) থেকে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়ে দলে দলে এপার বাংলায় পশ্চিমবঙ্গে আসছে একটু ভাল ভাবে বাঁচার জন্য। তৎকালীন সরকার বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণশিবির করে ঐসব উদ্বাস্তুদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বাস্থ্য শিবির করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সরকার বদলেছে, উদ্বাস্তুদের কিছু কিছু জায়গাও পরিবর্তন করতে হয়েছে।

উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকার মধ্য হাবড়া, অশোকনগরকে উদ্বাস্তুনগরী বলায় 'উদ্বাস্তুদের জন্য এই এলাকার উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাজার-হাট, রাস্তা আলো, যানবাহন, পানীয় জল ইত্যাদি। উন্নয়নের কাজ হয়েছে, সবদিক থেকে উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। এতো ছোট্ট জায়গায় এতো বেশি স্কুল, কলেজ পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারতবর্ষ শিক্ষায়, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, কারিগরী শিক্ষা, বিদ্যুৎ, সামরিক সুরক্ষা, জাতীয় সড়ক (এন.এইচ.রোড) অর্থ, সর্বদিক থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু অন্য রাজ্যের তুলনায় ধাপে ধাপে পশ্চিমবঙ্গ আনেক পিছিয়ে আছে।

একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, বছরের পর বছর রাজনীতির ডামাডোলে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা।

ন্যূনতম বাঁচার অধিকারটুকুও তারা হারিয়েছে। না পারছে ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুল-কলেজে শিক্ষা দিতে, না পারছে অসুস্থ মানুষকে ভালো জায়গায় রেখে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে। আছে ভুরি ভুরি প্রাইভেট স্কুল (ইংলিশ মিডিয়াম), কলেজ, কারিগরী কলেজ, প্রাইভেট হাসপাতাল, নার্সিংহোম। 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল' সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? এই প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে।

শত শত মানুষের জীবনের বিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। তাঁদেরকে প্রণাম জানাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হয়ে ন্যূনতম বাঁচার দাবি/অধিকার যেমন আছে তেমনই আছে রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেক নাগরিকের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। অধিকার এবং দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মানুষের প্রতিনিধি হয়ে দিনের পর দিন বছরের পর বছর রাষ্ট্র/দেশকে যাঁরা পরিচালনা করছেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাঁদের কাছে জানতে ইচ্ছা হয়, হাজারো মানুষের জীবনের বিনিময়ে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কি পেয়েছে? কবি গেয়েছিলেন—

'বল বল বল সবে শত বীনা বেণু রবে।
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।।'

হ্যাঁ, ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের দরবারে অনেকটাই স্থান করে নিয়েছে। বিজ্ঞান, পারমাণবিক প্রযুক্তি, সামরিক সুরক্ষা, শিল্পকলা, কৃষি, কূটনীতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেকটাই এগিয়ে আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কি চেয়েছেন? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল রাজনৈতিক দল/সংগঠন দেশের বা রাজ্যের মানুষের সমর্থনে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে দেশ/রাজ্য পরিচালনা করে আসছেন, তাঁদের কাছে জানতে ইচ্ছা হয় যে, দেশ ভাগের পর সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা ছিল পেটে দু-মুঠোভাত, পরনে এক টুকরো কাপড়, শিশুদের/সন্তানদের শিক্ষা, অসুস্থদের চিকিৎসা, আর রাতে শান্তিতে একটু ঘুম। কি পেলো পরিবর্তে? হিংসা, প্রতিহিংসা, দুর্নীতি, কালোবাজারি, মূল্যবৃদ্ধি, গুণ্ডামি, রাহাজানি, জুলুমবাজি গ্রামগঞ্জে ভরে গেছে। মানুষ প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কে, ভয়ে দিন গুনছে। গণতান্ত্রিক দেশে এ কি ধরনের স্বাধীনতা? ভাই-ভাইকে খুন করছে, স্বামী-স্ত্রীকে খুন করছে, স্ত্রী-স্বামীকে খুন করছে, ছেলে মাকে, বাবাকে খুন করছে, এ কি স্বাধীনতা? রাজনৈতিক দল/সংগঠনগুলি জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। যাদের সমর্থনে আজ তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের কথা মনে থাকে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরী, একটি শিশুকে জন্মগ্রহণ করা থেকে ধাপে ধাপে দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠতে হচ্ছে। ভারতবর্ষের মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই স্বাধীনতা চেয়েছিল? যাদের রক্তের বিনিময় সন্তানহারা মায়েদের চোখের জলের বিনিময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তাঁদের কাছে আজ কি কৈফিয়ত দেবেন?

সাধারণ মানুষ যখন বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখনই আসে গণ আন্দোলনে। অতিষ্ঠ হয়ে যায় মানুষ। সরকারের পরিবর্তন চায়। ভোট আসে সরকার পাল্টায়। অনেক পরিকল্পনা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ একটু হাফ ছেড়ে বাঁচে। 'যাক, এবার আমরা একটু ভালোভাবে খেয়ে পরে বাঁচবো।' কোথায়? প্রত্যাশা প্রত্যাশাতেই রয়ে গেল। এই সরকার আরও সাংঘাতিক। আবার ভোট এলো। সাধারণ মানুষ আবারও পরিবর্তন চাইলো। যথারীতি একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি। পরিকল্পনা নিয়মমাফিক সরকার পাল্টালো। সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

নতুন সরকার গঠন হলো। মন্ত্রী, বিধায়ক নেতাদের বড়ো বড়ো লেকচার, গ্রামে-গঞ্জে সভা মিছিল, আশ্বাসের বাণী, সাধারণ মানুষ যাদের দু-মুঠো খাবার জোটে না তারা ভাবলো 'এবার গরীবের সরকার এসেছে। আমরা ভালো ভাবে খেয়ে পরে কাজ করে বাঁচতে পারবো।' সে আশায় বালি। অত্যাচারের মাপকাঠির পারদ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কথায় আছে—'যে যায় লঙ্কায়/সেই হয় রাবণ।' এইভাবে একের পর এক সরকার পাল্টাচ্ছে। গণতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য ঘটা করে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপাল। তারপর যে কে সেই। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়েও পরাধীনতার থেকেও খারাপ অবস্থায় দিন যাপন করতে হচ্ছে। এইভাবে চলছে স্বাধীনতার ৭৯টি বছর। ৯০ ছুঁই-ছুঁই বয়সে এসে প্রশ্ন জাগে, একি স্বাধীনতা দেখছি! জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক সংগঠন/দল-এর কাছে করজোড়ে মিনতি জানাই, আপনারাও একটু ভাবুন, আপনাদেরও সমাজের এবং সাধারণ মানুষের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা আছে। আপনারাও এই সমাজের বাইরে নন।

কম খরচে বই প্রকাশে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন -

গ্রামবাংলার খবর

ফোন : **7679520350 / 9748282987**

সমাজ পরিবর্তনে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা

হিমাংশু দাস

কৈশোরকাল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করবার সুযোগে, মানব সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রকাশ, সামান্য হলেও অনুধাবন করতে পেরেছি। সেই ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে মানবিক মূল্যবোধ তথা সার্বিকভাবে সামাজিক অবক্ষয়ের মুখে দাঁড়িয়ে মনে শুধু প্রশ্ন জাগে, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ গঠনের ভাবনায় বর্তমান মানব সমাজ কি আদৌ এতটুকুও নিজেকে প্রভাবিত করতে পেরেছে? অবশ্য বর্তমান বিশ্বের বহু দেশেই স্বামীজী এবং তার গুরুদেব শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই চর্চা চলছে। মানুষ তৈরিই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের মূল লক্ষ্য। তিনি বিভিন্ন সময় উদাত্ত কণ্ঠে সমাজের দরিদ্র, লাঞ্ছিত, অপমানিত, শোষিত অত্যাচারিত মানুষদের অধিকার রক্ষা করবার জন্য—আহ্বান জানিয়েছেন। কানে বাজে তাঁর সেই আগুনঝরা বাণী—

'হে ভারত! ভুলিওনা—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'

অবাক লাগে তখনই যখন শোনা যায় নীচু জাতের মানুষজন এখনও মন্দিরে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্নভাবে অপাংক্তেয় হয়ে থাকে। অত্যাচারিত লাঞ্ছিত হয়। আমাদের দেশেরই নীচু জাতের ঐসব মানুষেরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। হয়তো অনুসন্ধানে প্রকাশ পাবে, ঐসব মানুষগুলোই আমাদের দেশের মূল অধিবাসী, তারা বহিরাগত নয়!

স্বামীজী বলে গেছেন 'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রু মোচন করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার তুলে দিতে পারে না, আমি সেই ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা বলা বা দর্শন শাস্ত্র শোনানো অপমান করা। তিনি আরও বলে গেছেন, 'দুইটি বিষয় হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতা প্রিয়তা ও ঈর্ষা'। তিনি বলেছেন— 'হিন্দু ধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতায় মানবত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে অন্য কোন ধর্ম এরূপ করে না।'—'খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।' ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী আরও বলে গিয়েছেন 'দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।' তাইতো তিনি বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' তাঁর কথায়—'সম্প্রদায় থাকুক কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক।'

আজ যখন জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের বিভাজনে আচ্ছন্ন হয়ে, মানব সমাজ নিজেদের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার বিষবৃক্ষ রোপণ করে চলেছে, আর স্বামীজীর মানবতাবাদী এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ণ হয় না, তখন স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বায়ন—অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অফুরন্ত সুযোগে ব্যবহারে প্রকৃত পিছিয়ে পড়া মানুষজন আরও পিছিয়ে যায়। নষ্ট হয় কর্মসংস্থানের সুযোগ, বৃদ্ধি পায় বৈষম্য। সম্ভবতঃ বিশ্বব্যাপী মানব সমাজের সামনে ঘোর সংকট আসন্ন। আর এখানেই স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া ইতিবাচক চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা—যা শুধু আমাদের মহান দেশকে নয়, সারা বিশ্বকেই পথ দেখাতে পারে। তাছাড়া তাঁর মতে, যা অনেক আগেই প্রকাশমান যে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শনের সমন্বয়েই মানব সভ্যতার অগ্রগতি বা ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হতে পারে, কিন্তু আমরা তো বিপথগামী বোধ হয়!

আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষ এই মুহূর্তে আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা (মাতৃবন্দনা)-কে কেন্দ্র করে শারদীয়া উৎসবের মুখোমুখি হয়ে বাংলার চিরকালীন কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করার উদার মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে দিন গুনছি।কিন্তু বাংলার চিরকালীন কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং বাঙালিয়ানার ধারাকে আমরা ধরে রাখতে পারব তো? কারণ যেভাবে অ-বাঙালি সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে বাংলায় এবং ঘটানো হচ্ছে—তাতে নিজেদের পায়েই নিজেরা কুড়াল মারছি না তো? একটু অ-প্রাসঙ্গিক হলেও বলতে হয়, স্বামীজীর ভাবশিষ্য দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকেও আজ বাঙালি দ্বারাই অপমানিত হতে হচ্ছে। যার থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হয় কি?

সমাজ গঠনে ধর্মের একটা ভূমিকা রয়েছে বলেই স্বামীজী বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যের, অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের নামই 'ধর্ম'। তাঁর মতে, মতবাদ—অনুষ্ঠান পদ্ধতি-শাস্ত্র-মন্দির প্রভৃতি এই দেবত্ব বিকাশের সহায়ক মাত্র।

সর্ব ধর্মের প্রসূতি স্বরূপ সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে তিনি, তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছেন, 'যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মত গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীদের মত সহ্য করি, তাহা নহে—সকল ধর্মকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।' তিনি ধর্মান্ধতা বিরোধী ছিলেন। তাঁর মধ্যে কাজ করতো ইতিবাচক মানসিকতা। নিজেকে সমাজতন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করা স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক মানসিকতার মধ্যেও মূলত ছিলেন বাস্তববাদী, শিক্ষা প্রসারে বিশেষ করে নারী শিক্ষা ও তাদের সম্মান রক্ষার প্রশ্নে তিনি ছিলেন কঠোর মনের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উন্নয়ন ভাবনার মিলন বা সমন্বয়ের উপরই তিনি দারিদ্র মোচন ও উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতেন।

তাই সমাজের কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনে এবং প্রকৃত ধর্মানুসন্ধানে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বিকল্প নাই। তিনি মনে করতেন 'অন্ত প্রকৃতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কোন পরিবর্তনই সম্ভব নয়।'

দেশের ছাত্রযুবদের উত্থান, নূতন আলোর দিশা

কার্ত্তিক ইন্দু

গোদি মিডিয়া, ভারতবর্ষের ধনীক শ্রেণি নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া, হিটলারের সচিব গোয়েবলস্‌সের পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশে সতত প্রচার চালাচ্ছে। আর-এস-এস পরিচালিত বিজেপি সরকারের প্রধান নরেন্দ্র মোদিকে কোনো অবস্থাতেই মাথা নীচু করানো যাবে না। ছলে বলে কৌশলে এই প্রচারকে নূতন ভাষা, নূতন পোষাক ও নূতন কায়দায় প্রচার চলছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ পত্রিকা, দূরদর্শন-সহ প্রায় সব ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম দেশের পুঁজিপতিরা কিনে নিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মধ্যেও সাধারণ মানুষ যেটুকু সংবাদপত্র পাঠের বা টিভি দেখার সুযোগ পান সেখানে ঐ কেন্দ্রীয় সরকারের জয়গান। তথ্য বিকৃত অতিরঞ্জিত করে সতত ভুল তথ্য পেশ করে মানুষকে কুপথে চালিত করছে।

মোদি সরকারকে পিছু হটানো যাবে না এই মিথ গত চার বছর আগে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। ভারতের কৃষক সমাজ প্রায় ৭০০ প্রাণের বিনিময়ে দেড়বছর ব্যাপী আন্দোলনের মাধ্যমে। কৃষকদের মূল তিনটি দাবি মোদি সরকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। যদিও সবক্ষেত্রে যথাযথ রূপায়ণ হয়নি। বিশেষত, কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যূনতম মূল্য, বিদ্যুৎ ও সারের ভর্তুকি নিয়ে কৃষকদের দাবি পূরণ হয়নি। বিভিন্ন সভা সমিতিতে কৃষক আন্দোলনের নেতারা সরকারকে অভিযুক্ত করেন। কৃষিজাত দ্রব্যের সুষম বিক্রয়ের জন্য কৃষকমান্ডি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কৃষক ও ক্রেতাদের মধ্যে মধ্যসত্ত্ব (দালাল)-রাও বড় বিপদ। সরকার প্রতিশ্রুতির খেলাপ করছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে তাই বিজেপি সর্বাত্মক ধর্মীয় মেরুকরণ, দেশি ও বিদেশী পুঁজির আর্থিক সহযোগিতা তৎসহ গোদি মিডিয়ার হাত ধরে লোকসভায় ৪০০ আসনের জন্য ঝাঁপিয়ে ছিল। ভারতবাসী ভারতের সচেতন ভোটদাতারা মোদির আশা পূরণ হতে দেয়নি। তাকে অন্য দলের সহযোগিতা নিয়ে তাদের ওপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বিজেপি দেশকে পশ্চাদপদ পথে, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বিভেদের পথে নিয়ে চলছে। মাত্র ৪ মাস আগে বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে বিজেপি ক্ষমতা দখলের পর নূতন উদ্যমে পুরনো পথে চলার চেষ্টা করছে।

এরকম অবস্থায় মাত্র ৪/৫ মাস আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির একটি মন্তব্যে, দেশের আন্দোলনরত ছাত্রযুবদের 'ককরোচ' (আরশোলা) বলে মন্তব্য করায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে 'ককরোচ জনতা পার্টি' গঠন করে। আমেরিকায় পাঠরত অভিজিৎ দীপকে ও তরুণ সমাজ যাদের নূতন নামকরণ 'জেন-জি', শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি নিয়ে পথে নামে। নিট্ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, বারবার পরীক্ষা বাতিল ২২/২৩ জন ছাত্রছাত্রীর আত্মহননে মধ্যবিত্ত ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় দিল্লির বিখ্যাত বিক্ষোভ জমায়েত স্থল যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ। মাত্র ২৫ দিনের আন্দোলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পথে টেনে নামাতে দাম্ভিক মোদিকে বাধ্য করে। শুরু হয় বিজেপি সরকারের পিছু হটা। জেন-জির দ্বিতীয় সাফল্য এসেছিল ওই আন্দোলনে। ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছিল (এফ.আই.আর.), তা প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যিনি এই যুবসমাজকে আরশোলা বলেছেন, দিল্লি আন্দোলনের ভিডিও দেখতে সময় নেই বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তারই নেতৃত্বে তিনজনের ডিভিশন বেঞ্চ অনুরূপ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন যে, শুধু দিল্লিতেই নয়, সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড-সহ অন্যান্য রাজ্যেও আন্দোলনকারীদের ওপর কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। এরই সাথে সাথে যে ২২ জন ছাত্রছাত্রী আত্মহনন করেছে তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে এককোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।

ছাত্রযুবরা কোনও রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে মুখ খুলছে না। তারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশা সাধারণ মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরছেন। স্কুলের বেহাল দশার কথা সাধারণ মানুষ জানতে পারছেন। ককরোচ পার্টির নেতৃত্ব অভিযোগ করছেন, শুধু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নয়, যে সব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আছে তারা সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা, বিদ্যালয় ভবনের দৈন্যদশা তুলে ধরছেন, আক্রান্তও হচ্ছে বিজেপির গুন্ডা ও পুলিশের দ্বারা। অথচ যেখানে অন্য দলীয় রাজ্য সরকার আছে তারা অবস্থা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কোথাও কোথাও কাজ শুরু হয়েছে। লক্ষণীয়, ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার বা মোদির বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করলেই পুলিশের নজরে পড়তে হতো বা জেল, জরিমানা করা হতো। জেন-জি আন্দোলনের ফলে বিহারের মাত্র ৬ বছরে শিশু, দিল্লির ১৫ বছরের একটি মেয়ে-সহ এমনটি সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ও বর্তমান সেনানী তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে সাহস সঞ্চয় করেছে। আশার কথা, অভিজিৎ দীপকে সরাসরি বলছেন, এদেশে হিন্দু মুসলিম রাজনীতি না হলে অনেক বড়ো বড়ো সিংহাসন নড়ে উঠবে। যখন ইস্যুভিত্তিক যেমন শিক্ষা, বেকারী, ক্ষুধা এসব নিয়ে রাজনীতি হবে, তখন আমজনতার, দেশের মঙ্গল হবে। ককরোচ পার্টি তা করার চেষ্টা করবে। পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক সৌরভ দাস বার বার বলছেন—এখন তরুণ প্রজন্ম প্রশ্ন করবে, ক্ষমতাসীন সরকারকে তার জবাব দিতে হবে। বিজেপির হিন্দু-মুসলিম রাজনীতির মস্ত সুবিধা। সরকারকে ব্যর্থতার দায় নিতে হয় না। জবাবদিহির দায় থাকে না। বর্তমান শাসক তাই করছে। যন্তর মন্তরের আন্দোলন বিজেপিকে সেই আয়নার সামনে দাঁড় করে দিয়েছে। যুবসমাজ সেই আশাতেই বুক বাঁধছে।

এক নতুন চিত্র পরিচালক

ড. অরুণ অধিকারী

স্থান অশোকনগর মিলনী সংঘ দুর্গাপুজো কমিটি মিটিং। সুব্রত বলল—এবার প্রধান অতিথি হিসাবে সানন্দাদিকে আনার প্রস্তবা রাখছি। আমাদের পাড়ার মেয়ে 'এক নূতন সকালের সন্ধানে' সিনেমার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন। সানন্দা গোস্বামী অশোকনগরের মিলনী সংঘ পাড়ায় জন্ম, বেড়ে ওঠা। বিয়ে হয়েছে যাদবপুরে। স্বামী আর্মি অফিসার। সানন্দা বাংলার প্রফেসর। প্রচুর গবেষণালব্ধ বইপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা আছে। দূরদর্শনে কিছু কিছু সিরিয়াল ওনার চিত্রনাট্যে তৈরি এবং হিট। পরে তিনি সিনেমা তৈরি করেন। এটা তার দ্বিতীয় ছবি। এবং তা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত।

হ্যাঁ পুজো কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রান্ট হলো। মিলনীতে বিশেষ অতিথি সানন্দা গোস্বামী আসছেন, পুজো উদ্বোধন করবেন। চলচ্চিত্র ও চালচিত্র নিয়ে আলোচনা করবেন। ব্যবস্থাপক হলেন ওই ক্লাবের সদস্য মানিক দত্ত। তিনি অশোকনগর লিটল ম্যাগাজিন উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক। জানা গেছে সাহিত্য ভেঙ্গে নূতন সিনেমার নূতন সাহিত্য কাব্য এনেছেন এই সানন্দা গোস্বামী। ১৫ অক্টোবর ২০২২। পুজো উদ্বোধন। সানন্দা গোস্বামীর গাড়ি এলো। সাথে পুত্র, কন্যা, সুদর্শন স্বামী। নিয়ম মেনে পুজো উদ্বোধন হলো। স্টেজে বসলেন সানন্দা ও তার স্বামী সদানন্দ মিত্র। ৩২ বছরের সানন্দাদেবী আজ যে মা দুর্গার সাজে মন্ডপে বসে আছেন! শুধু মুকুটটা নেই। বাকিটা সব যেন মায়াময়ী দুর্গা প্রতিমাবেশি সানন্দা। অ্যাঙ্কার মানিকদা এখানকার লোকাল হিরো, কবি, সাহিত্যক, সমাজসেবক, একটা পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক আরো অনেক গুণের মানুষ। শুরুতে অভ্যর্থনা পর্ব। পরিচয় পর্ব। মঞ্চে রয়েছেন সানন্দা, তার স্বামী সদানন্দ, পৌরসভার চেয়ারম্যান, লোকাল এম.এল.এ এবং একটা স্কুলের হেডমাস্টার। এবার শুনুন, চিত্র পরিচালকের বক্তৃতা। আমাদের পাড়ার মেয়ে সানন্দা গোস্বামী চিত্র পরিচালক এবং তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত, আমাদের গর্ব। সানন্দা দেবী কিছু বলবেন, তার সাহিত্য, চলচ্চিত্র জীবন নিয়ে কিছু মূল্যবান বক্তব্য শুনুন। সানন্দা দেবী মাইক ধরলেন। মন্ডপে ঠাকুর প্রতিমা, স্টেজে এ যেন জ্যান্ত প্রতিমা। কথা বলতে উঠলেন। লাইট, ক্যামেরা, ঝলকানি যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে স্টেজে। বক্তব্যের প্রথম লাইনেই দর্শক, শ্রোতারা কুপোকাত। এ কি বক্তব্য! শুনুন এবার, আমি আজ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু পুরস্কারটি আমাকে দেওয়াটা ঠিক হয়নি বলে আমি মনে করি। যার গল্পটি নিয়ে আমি ছবি বানালাম সেই গল্পের লেখক এই পুরস্কারটা পাওয়ার যোগ্য। আমি নই। গল্পের লেখক অশোক মণ্ডলকে এই পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। এই কথাটা রাষ্ট্রপতি ভবনে বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম। গল্পটা আমি পেয়েছিলাম বসিরহাটে একটা পুজোবার্ষিকী থেকে। যমুনাপতী পূজা বার্ষিকীতে অশোক মণ্ডলের গল্পটা পাই ২০১৮ সালে। গল্পটির নাম ছিল 'সঙ্গী আমার, ভালোবাসা তোমার'। এটা নিয়ে সিনেমা বানাই ২০২০ সালে। দর্শক মহলে ভালো সাড়া পড়ে যায়। এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে আমি অশোক মণ্ডলকে খুঁজছি। যমুনাপতী সম্পাদক মহাশয় সরোজ চ্যাটার্জী ঠিকানাটা দিতে পারলেন না। পত্রিকা দপ্তরে লেখাটা জমা পড়েছিল বসিরহাটে একটা সাহিত্য সভায়। নাম ছিল, কিন্তু ধাম ছিল না। তখন তো এখনকার মতো ফোন বা মোবাইল নম্বর ছিল না। সংক্ষেপে সানন্দাদিদি বললেন, দর্শক শ্রোতাদের অনেকের চোখে জল চলে এসেছিল। আজও সঙ্গী পেতে কত কিছু করি। সঙ্গী মানুষকে কিভাবে ব্যবহার করে? কী তার পরিণতি?

দর্শক, শ্রোতা, পুজোর আয়োজক সবাই প্রশংসা করলেন। সত্যিই আজ এক গর্বের দিন। পুরো প্রোগ্রাম ক্যামেরাবন্দী হলে। মোবাইল বন্দী হলো, যা হয় এখন। সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লো ঘটনাটা। পরের দিন দমদম থেকে ফোন এলো পরিচালকের কাছে। সাগরিকা সামন্ত বলছি। ফেসবুক থেকে আপনার প্রোগ্রাম দেখলাম ভালো লাগল। আপনি অশোক মণ্ডলকে খুঁজছেন তো? আমি তাকে চিনি। সুন্দরবনের ভাণ্ডারখালি গ্রামে থাকে। আমার পরিচয়টা গোপন রাখবেন প্লিজ। বলেই ফোনটা কেটে গেলো। রাত ১১.৩০টার সময় এরকম ফোন পেয়ে সানন্দা দেবী অবাক। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ম্যাজিক দেখে তাঁর মূর্চ্ছা যাওয়ার জোগাড়।

পরের দিন সকালে কলব্যাক করা হলো, কোনও অস্তিত্ব পাওয়া গেল না। অগত্যা একটা শব্দ পুঁজি। ভাণ্ডারখালি গ্রাম সুন্দরবন। খুঁজতে হবে অশোক মণ্ডলকে। সানন্দাদেবী লোক পাঠালেন ভাণ্ডারখালিতে। অশোক মণ্ডল বলে কাউকে ওরকম পাওয়া গেল না। এক অশোক মণ্ডল আছে কিন্তু সে তো বি.ডি.ও। ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার।

পরিচালক নিজেই যাবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। তার মন বলছে ওখানেই পাওয়া যাবে সেই গল্পের লেখক অশোক মণ্ডলকে। সাথে তাঁর সহকারী অসীম বাবুকে নিলেন। তাঁর প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় বক্তিত্ব স্বপ্না মিত্রকে নিলেন সাথে যাতে করে সহজে খুঁজে পান। এই স্বপ্না মিত্র শাস্ত্রজ্ঞ কণা বিশারদ। সানন্দা দেবীর কলেজেই সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। তাঁর স্বামী মনোবিদ্যার অধ্যাপক সম্ভবত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সানন্দাদেবীর সহকারীরা এরকম এক একজন দিকপাল। এরা সবাই অধ্যাপক হলেও বহু কষ্টের জীবন এক সময় কাটিয়েছেন। মানুষের জীবন অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবন খুব কাছ থেকে দেখেছেন। পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। জীবন সংগ্রাম মানেই তো মগজের পুষ্টি, একথা তো সত্যজিৎ রায় কবেই বলে গেছেন উৎপল দত্তের মুখ দিয়ে। হায় বাঙালি বই পড়ো, না হলে পিছিয়ে পড়বে। না সত্যজিৎ রায়ের মতো আরো যারা আছেন তাদের সিনেমাগুলো দেখো। আজকে দেখবে যা, ভবিষ্যতে তোমার মগজের ধার ও ভার বাড়াবে। উন্নত বুদ্ধি ও জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী হবে। বাঙালির তৈরি ভালো ভালো সিনেমা দেখে যাও।

সকাল ৬.৪৫-এর হাসনাবাদ লোকাল ধরলেন বারাসাত থেকে।

হাসনাবাদ থেকে নৌকা পার হয়ে অটো করে লেবুতলা পৌঁছালেন ১১.৩০। এবার বড় এক নদী পার হয়ে ভান্ডারখালি দ্বীপ।

তখন ভাঁটা ছিল। তাই জুতো খুলে নদীতে উঠতে হলো। ওপারে নেমে ঘাটের উপরে উঠে পুকুরে পা ধুয়ে নিলেন। বাজারে চায়ের দোকানে চা এবং ওজন করে বিক্রি হওয়া কম তেলের পরোটা ভাজা ঘুগনি দিয়ে খেলেন সবাই। কেন সানন্দারা এখানে এসেছেন দোকানদারকে বলা হলো।

অশোক মণ্ডলকে খুঁজতে এসেছি। ভদ্রলোক শিল্পী। গল্প পড়ে মনে হয়েছিল সানন্দা দেবীর। বয়স ত্রিশের কোটায় হবে। চায়ের দোকানদাররা এলাকার প্রচুর খবর রাখেন বলে কথিত আছে। তা যে সত্য তা প্রমাণ হলো। প্রায় হাফ ডজন অশোক মণ্ডলের পরিচয় খুঁজে বার করলেন দোকানদার। এমতাবস্থায় অশোক, অশোক নাম শুনে ভেড়ি থেকে এক দাড়িওয়ালা যুবক নেমে এলেন। অশোক মণ্ডলকে চাই। কোন অশোক মণ্ডল? মিষ্টির দোকানের ময়রা দাঁত বার করে ইয়ারকি মারতে মারতে বললেন—পাগল অশোক মণ্ডল। সানন্দাদেবীর মগজে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেলো, দমদমের সাগরিকা সামন্তের ফোন, অশোক মণ্ডল ভান্ডারখালি, রহস্যঘন গল্পের পরিমণ্ডল এখানে বর্তমান।

সানন্দাদেবী বলে উঠলেন, নিজের অজান্তেই হ্যাঁ হ্যাঁ হতে পারে পাগল। ভেড়ি থেকে দোকানে নেমে আসা যুবক বললেন, হ্যাঁ অশোক আমার বন্ধু। যুবকটি টিউশন করে ফিরছিলেন। জটলায় অশোক অশোক আওয়াজে উৎসাহ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। উনিও একটু-আধটু লেখেন। অশোক মণ্ডলের বাল্যবন্ধু বিজন সর্দার। আর্টস গ্রাজুয়েট। সানন্দাদেবীরা ভেড়ির রাস্তা ধরে হাঁটছেন, সাথে বিজন সর্দার। এবার অশোক মণ্ডলের ইতিহাস ভূগোল নিয়ে কথা বলাবলি হচ্ছে। অশোক ছোট্টবেলা থেকেই লেখালেখি করতেন, প্রাইমারী টিচার জগদীশ সমাজপতির অনুপ্রেরণায়।

এই যুবকটিই বসিরহাটের এক সাহিত্য সভায় যমুনাপতী শারদীয়াতে অশোকের গল্পটি জমা করেছিলেন। মেধাবী অশোক একটু অস্বাভাবিক ভাবগ্রস্ত। বহুদিন চিকিৎসার পরে তখন একটু ভালো। বাচ্চাদের ছবি আঁকা শেখান। তাঁর মাটির তৈরি বাড়িতে তার স্কুল। প্রায় বিনা পয়সাতে বাচ্চাদের পড়ান এবং আঁকা শেখান। এক সময় এই এলাকার ভালো টিউশন টিচার ছিলেন। দুবার স্কুল সার্ভিস-এ পাশ করেও চাকরি হয়নি। বিধবা মা নিয়ে থাকেন। বাবা মারা গেছেন সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে। সে রহস্য চাপা রয়েছে। খুন না বাঘ তা নিয়ে আছে সন্দেহ।

সাগরিকা সামন্তকে টিউশন পড়াতেন ক্লাস ফাইভ থেকে এবং ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ান। তার পরে প্রেম পর্ব। শেষ হয় কারণ সাগরিকার বাবা জমিদার ধীরাজ সামন্ত জোর করে দমদমবাসী ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন।

ধীরাজ সামন্ত এখনও জমিদারি স্টাইলে বাস করেন। ১০-১২টা লঞ্চ আছে তাঁর। ৫টি ইট ভাঁটা। কলকাতায় বাড়ি। আবার তখন আর.সি.পি এর জেলা পরিষদ সদস্য। এবং ব্লক সভাপতি। রাজনৈতিক আধিপত্য, লোকবল, ধর্ম বলের প্রাচুর্য্য বর্তমান।

সাগরিকার বিয়ে অন্য জায়গায় হচ্ছে জেনে অশোক সমস্ত প্রেমপত্র নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিল। সফল হয়নি। বরং তার বাবা লোক দিয়ে অশোককে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেয়। ভাগ্য ভালো মরেনি। ভাটায় নদীর চরে আটকে ছিল। স্থানীয় লোকেরা সকালবেলায় দেখতে পেয়ে বসিরহাট হসপিটালেও পাঠায়। প্রায় ১ মাস চিকিৎসা সেবায় সুস্থ হয় সে। বাড়ি এসে সাগরিকাকে দেখতে চায়। কি করে দেখবে সে। সাগরিকা তো তখন দিব্যি শ্বশুরবাড়িতে স্বামীকে নিয়ে হানিমুনে ব্যস্ত। এরকমই হয়। না হলে দেবদাস সিনেমা বাংলা তথা ভারত তথা সারা পৃথিবীতে হিট সিনেমা হয় কি করে! মানব সভ্যতার গ্রাম্য পরিবেশে প্রায় সব পাড়ায় একটা দুটো বা তার বেশি দেবদাস এবং পারু (পার্বতীর ডাকনাম) আছে।

ভেড়ির রাস্তায় কথা বলতে বলতে সানন্দা টিম-সহ সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে পৌঁছালো। কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় গরান কাঠের তৈরি (খুব শক্ত কাঠ গরান এবং সুন্দরী, কেওড়া) বেঞ্চ। ছোটো একটা ঘর আছে বেত ও হোগলা পাতা দিয়ে। ওখানে বসে হ্যারিকেনের আলোয় অশোক লিখতেন। একঘেয়েমি কাটাতে ওখানকার মানুষ ভেড়ির উপর এসে নদীর সঙ্গ নিয়ে ও তাজা অক্সিজেন নিয়ে তৃপ্ত হয়।

একপাশে নদী অন্য পাশে বসতি মাঝখান দিয়ে রাস্তা মানে ভেড়ি। নদীর জল যাতে বসতি এলাকা চাষের জমি লবণজলে ডুবিয়ে ক্ষতি করতে না পরে তার জন্য এই ভেড়ি রক্ষক। তাও তো আয়নার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলের তান্ডব ভেড়ি মানে না। বসতি এলাকা জলমগ্ন হয়ে সাগরের রূপ নেয়।

কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচ দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে অশোকের স্কুল বাড়িতে। নীচে নেমে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সবুজ ধান খেতের মধ্যে মাটির বাড়ি। গোল পাতার ছাউনি। বনবিবির মন্দির। নৌকা তৈরির কর্মশালা (ওয়ার্কশপ)। অশোকের স্কুলে যাওয়া হলো। বিজন সর্দার বন্ধুকে ডাকলেন, অশোক এত লোক দেখে ঘাবড়ে গেলেন। ধীরাজ সামন্তের লোক নয় তো এরা। বন্ধুকে অভয় দান করলেন বিজনবাবু এবং বললেন—অশোক তোর সাথে দেখা করতে এসেছেন এনারা। তোর সেই গল্প 'সঙ্গী' যমুনাপতীতে ছাপা হয়েছিল। সেই গল্প থেকে সানন্দা দিদি সিনেমা বানিয়েছে এবং উনি তার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন। তাই উনারা এসেছেন তোর সাথে দেখা করতে।

ও তাই! তা বলুন কি বলবেন। সানন্দাদেবী প্রথমে মুখ খুললেন এবং বললেন আপনার আরো লেখা চাই আমরা।

অশোক তাচ্ছিল্য হাসি দিয়ে, লেখা! কই আমি তো লিখি না। ছবি একটু আধটু আঁকি, আঁকা শেখাই। তা অবশ্য এই প্রকৃতির গুণে। এই প্রকৃতি আমাকে দিয়ে আঁকিয়ে নেয়। আসলে ওর সারাজীবনের লেখা, ছাপা অছাপা সব পুড়িয়ে দিয়েছে অশোক।

অশোকের লেখার প্রধান ভক্ত ছিল ছাত্রী সাগরিকা। সাগরিকার অনুপ্রেরণায় লেখার জগৎ ওর সমৃদ্ধ। সাগরিকা নেই, অশোকের লেখক সত্ত্বাও নেই। সুন্দরবনের বন্ধু বিজন সর্দার বললেন, ওর

বিভূতিভূষণ নাম দিয়েছেন, আমাদের স্যার জগদীশ সমাজপতি।

যাইহোক, সন্ধ্যা হয়ে এলো। আজ ফেরা যাবে না। অগত্যা বিজন সর্দারের বাড়িতে রাত্রি যাপন। লেখককে বাঁচনোর জন্য সর্বতোভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন সবাই। সিদ্ধান্ত হলো, অশোকের চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন সানন্দা দেবী। ওনার লেখক সত্ত্বাকে আবার ফিরিয়ে দেবে মনোবিজ্ঞান। প্যাভলভ, ফ্রয়েড, জেমস ব্যা।

পরদিন ফেরার পালা। বিজনবাবু দায়িত্ব নিলেন পরের শুক্রবার আশোককে নিয়ে যাদবপুরে সানন্দাদিদির বাড়িতে আসবেন। রবিবার হাওড়া থেকে বিজনবাবুর সাথে অশোকবাবু এবং সানন্দাদেবীর সহকারী অসীমবাবুকে পাঠানো হবে। হাজার চারেক টাকা বিজনবাবুর হাতে প্রায় জোর করেই দিয়ে এলেন পরিচালক। আমরা এক নূতন সকালের সন্ধানো হাঁটবো এখন। অশোক মণ্ডল আবার লিখবেন। আমি তার গল্প নিয়ে সিনেমা বানাবো।

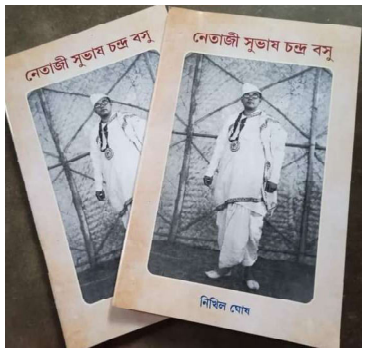
গ্রামবাংলার খবর

প্রকাশনা সংস্থার বই

ফকিরি গানের সংকলন গ্রন্থ
বাবা এসলাম ফকিরের
‘আত্মতত্ত্বের গান’



প্রাক্তন শিক্ষক নিখিল ঘোষের
‘নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু’



লক্ষ্মী গোস্বামীর কাব্যগ্রন্থ
‘স্মৃতি’

প্রাক্তন শিক্ষক নিখিল ঘোষের
‘কর্ণবধ কাব্য’।

প্রকাশের পথে দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
আঁধার পেরিয়ে

মনের মানুষ

কবিরুল (রঞ্জিত মল্লিক)

অফিস থেকেই ফিরেই উন্নতি ব্যাগ গোছাতে শুরু করল। বন্ধুর মেয়ের বিয়ের যেতে হবে। আজকাল কোন অনুষ্ঠানে উন্নতি যেতে চায় না। অনেকে অনেক রকম কথা বলে। আজ দেখতে দেখতে আটচল্লিশ বছরে অতিক্রম করল। এখনও ফেকাশে সিঁথিটা লালিত্যহীন, বসন্তহীন হয়ে গেছে। ওদিকে বন্ধুরা অনেকেই শাশুড়ি হয়ে গেছে। কারোর ছেলে কলেজ পাশ করে বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়ছে।

যাবার একদম ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রীতি বার বার করে বলেছে আসার জন্যে। তাই এড়াতে পারেনি।রীতি ওর হোস্টেল লাইফের বন্ধু। বিপদে আপদে পাশে পেয়েছে। অনেক সাহায্য করেছে। ওর জীবনে রীতির অনেক অবদান আছে। রীতির কথা ভাবতে ভাবতেই ওর ফোনটা ঝলসে উঠল।

'আসছিস তো মেয়ের বিয়েতে ? না আসলে ভীষণ খারাপ হবে।' ফোনের ও প্রান্ত থেকে রীতির ঝাঁঝালো গলা ভেসে আসে।

'যাব রে বাবা। কথা দিয়েছি। অনেক কষ্টে ছুটিটা ম্যানেজ করলাম।' উন্নতি শাড়িটা ভাঁজ করতে করতে বলল।

'আজ কত দিন পরে সবাই একসাথে মিট করছি বলত? সেই কোন কালে কলেজ ফিস্টে সবাই মিলিত হয়েছিলাম। মনে আছে ?'

'হ্যাঁ, আসলে আমার না আজকাল কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। জানিস তো সব।' উন্নতির চোখের কোণ চিক চিক করে উঠল।

'সব বুঝি রে, উন্নি। তাও তো ভাল। একা থাকিস। ঝামেলা নেই। আমার জীবনটা একবার ভেবে দেখেছিস। বিদর্ভ চলে যাবার পর থেকে আমি তো সেই সিঙ্গল মাদারই রয়ে গেলাম।'

'সেটাই, ঠিক আছে। আমার এখন অনেক কাজ। শোন না, পরে আবার কথা বলব।' বলেই ফোনটা রেখে দিল।

শাড়িটা ভাঁজ করতে করতে উন্নতি স্মৃতির গভীরে আটলান্টিক মহাসাগরে যেন তলিয়ে গেল। যত তলিয়ে যাচ্ছে স্মৃতির জাহাজ ওকে তাড়া করছে।

রীতির সাথে সেই বারো ক্লাস থেকে বন্ধুত্ব। বারো ক্লাস পাশ করার পর রীতি বিদর্ভের প্রেমে পড়ে। স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। পারিবারিক ব্যবসা আছে। কলকাতাতে বাড়ি, ফ্ল্যাট। গাড়িও আছে। পড়শোনাতেও বরাবর ভাল। তাই সুন্দরী রীতির বিদর্ভকে ভাল না বাসার কোন কারণ ছিল না।

খুব তাড়াতাড়ি ওদের বিয়েও হয়ে গেল। বিয়ের তিন বছরের মাথায় শ্রুতির জন্ম হয়। ভালই চলছিল সাদা কালো সংসারটা। মেয়ের হবার পর থেকেই হঠাৎ করে রীতির সংসারে অশান্তির মেঘ ঘনিয়ে আসে। বিদর্ভের পরিবার চেয়েছিল রীতির ছেলে হোক। হয়নি। আর এটাতে ওদের দুজনের কোন হাতও নেই।

বাবা, মায়ের বাধ্য ছেলে শিক্ষিত বিদর্ভও কন্যা সন্তান হবার জন্যে রীতিকেই কেন জানি না, কারণে অকারণে দোষারোপ করতে থাকে। দিনের দিন সাংসারিক অশান্তি বাড়তে থাকলে দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরী হয়। যার শেষ পরিণাম ডিভোর্স।

উন্নতি অনেক চেষ্টা করেছিল দুজনের সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার। বিদর্ভকেও কম বোঝানো হয় নি। ও ওর গোঁ ধরে বসে থাকে। শেষাবধি পারেনি ওদের বিবাহ বিচ্ছেদটা আটকাতে। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় রীতি ওর মতন অবিবাহিতা থাকলেই ভাল করত।

রীতির কষ্টের সাথে নিজের কষ্টটা বেশ মেলাতে পারে। রীতির মতন ওর অবস্থা না হলেও দুজনের সমীকরণ অনেকটা সেই রকম। যেটা আদৌ মেলেনি। তবে রীতি একটু আবেগপ্রবণ ছিল। অল্পতেই সবাইকে বিশ্বাস করে ফেলত। মনের কথা সকলের কাছে শেয়ার করত। সেইজন্যেই মাশুল তাকে দিতে হয়েছিল।

বিদর্ভকেও আর একটু কাছ থেকে চিনে নেওয়া উচিৎ ছিল। বিদর্ভ বিয়ের দুই বছরের মধ্যে অন্য একজনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। যেটা রীতি জেনেছিল অনেক পরে। তখন আর কিছুই করার নেই। কচি বয়সের প্রেম অল্প সময়ের মধ্যেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হল।

ব্যাগ গোছানো অনেকটাই শেষ হয়ে এসেছে। এবার বাকি কাজ গুলো সেরে নিতে পারলেই হল।ভাইপোটা অনেক্ষণ ধরে পিসিমণিকে দেখছে। উন্নতি একটু ফ্রী হতেই ঘরে ঢুকল।

'পিউমণি, তুমি শুনলাম শিলিগুড়ি যাচ্ছ?'

'কে বলল?'

'না, মানে ঠাকুরমা আর বাবাতে বলাবলি করছিল। তাই শুনলাম।'

'সারাদিন তো খেলা , টিভি দেখা ছাড়া কোন কাজ নেই। পড়াশোনা যে কি হাল হচ্ছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। রেজাল্ট যদি খারাপ করেছ , একদম বাড়ি থেকে বিদায় করে দেব।'

'শোন না , আমার জন্যে ফ্যান্সী মার্কেট থেকে এক জোড়া জুতো এনে দিও না। এখানে ওই ধরণের জুতো একদম পাওয়া যায় না।'

'দু মাস আগেই তো জুতো কিনে দিলাম। আবার কেন?'

'সামনে ওর জন্মদিন আছে। তাই ভাবলাম নিজের লুকটা একটু চেঞ্জ করব। সবই তো জান...'

'সব বুঝলাম। কিন্তু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে সব বৃথা। আবেগের কোন দাম নেই বুঝলি। ঠিক আছে। এনে দেব।'

'এই জন্যে না তোমার সাথে আমার এত ভাল বনে। আর শোন না পিউমণি , একটা হাতকাটা ল্যাডিজ্ জ্যাকেট। না মানে ভাবলাম জন্মদিনে একটা ভাল গিফ্ট দিতে হবে তো তাই। টিউশনি করে আমার না সেই রকম...'

ভাইপোর কথা শেষ না হতেই পিউমণি মুচকে হাসি হেসে বলল, 'ঠিক আছে। হবে।'

ভাইপোটা বাইরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। কদিনের ছুটিতে এসেছে। ও আসলে ওর সাথে সময়টা দিব্যি কেটে যায়। ওই একমাত্র উন্নতির

কষ্টটা বোঝে। দুজনে দুজনের মনের কথা শেয়ার করে। একে অপরের পালস্ টা বোঝে খুব তাড়াতাড়ি।

খুব সকালে ট্রেন ধরে ওকে। বেরোতে হবে। রাতে হালকা কিছু মুখে দিয়েই শোবার ঘরে ঢুকল। আজ অনেকদিন পরে সবার সাথে দেখা হবে। ভাবতেই সারা শরীরে একটা অপার্থিব শিহরণ। চোখে মুখে খুশীর ঝিলিক।

বিছানার উপর ক্লান্ত শরীরটা নেতিয়ে পড়তেই শোকেসের উপর রাখা ফটোফ্রেমের দিকে নজর পড়ল। একটা গ্রুপ ফটো। তাতে সমুর ছবি। বহুদিন আগের তোলা সে ছবিতে সমুকে বেশ প্রাঞ্জল দেখাচ্ছে। হলুদ, সবুজ পাঞ্জাবীতে যেন একটা সাহিত্যিকের ভাব ফুটে উঠছে।

সমুর কথা ভেসে উঠতেই বুকের বাঁদিকটা ব্যথায় চিন চিন করে উঠল। ব্যথাটা আগে বেশ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উঠত। ইদানিং তার গতি কমেছে। হতে পারে 'ব্যথা' নিজেও কষ্ট দিতে দিতে আজ সে বড়ই ক্লান্ত। দু ফোঁটা নোনা পানি নিজের অজান্তেই নাইটিতে পড়ল। চোখ মুছতে মুছতে নিজের মনেই বলে উঠল, 'সমুকে বলেছে নিশ্চয়? ও কি আসবে ? আসার তো কথা। এখন মৌলীকে নিয়ে সুখে সংসার করছে।'

সমু কি মনে রেখেছে সেই আটপৌরে শাড়ি পড়া, হালকা সাজে চিরদিনের সাধারণ মেয়ের মতন বেঁচে থাকা তার উন্নতি কে ? তার আদরের উন্নিকে ? হয়ত ভুলে গেছে। ভুলে যাবারই কথা। জীবনটা কারোর জন্যে পড়ে থাকে না। সেটাই তো বাস্তব। ও যে এইভাবে উন্নতির জীবনটা ফাঁকা করে চলে যাবে কে জানত ?

উন্নতির আবছা মনে পড়ছে...

'আমাকে সারা জীবন আগলে রাখবে তো? না কি অন্য কারোর হাত ধরে চলে যাবে?'

'উন্নি, এতবড় কথাটা বলতে পারলে? আমি জানি, তুমি আমাকে মোটেও ভালবাস না? ভালবাসলে হয়ত এ কথাটা বলতে পারতে না এত তাড়াতাড়ি, তাই না?'

'তুমি না পার? তোমার মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না? তোমাকে ভালবাসি বলেই তো এতটা ভরসা করতে পারি। তবে...।'

'তবে কি?'

'মাঝে মাঝে ভয় হয় জান। যদি তুমি আমাকে ভুল বুঝে বা একা ফেলে পালিয়ে যাও অন্য কারোর হাতে ধরে।তাই...'

'ও রে আমার পাগলি উন্নি! আমাকে এত ভয়। এবার একটু হাস দেখি....'

'ভয় তো হবারই কথা। আসলে তোমাকে ভালবাসি প্রচণ্ড। তাই ভয় হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও অন্য কারোর সাথে...'

'এ কথা তুমি বলতে পারলে। তোমার এইসব শুনলে আমারও ভয় হয়।'

উন্নতি আর নিজেকে সামলাতে পারে না। বালিশটা বুকে শক্ত করে জড়িয়ে সমুর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। নিজের অজান্তেই মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে ওর নাম,'সমু....! সমু...!'

সেদিনের ছোট্ট তাতান নিজের ভাল মন্দ বোঝে। পিউমণির কাছে সব কিছু মন খুলে বলে। সেও একজনকে ভালবেসে সংসার পাততে চাই। সব কিছু গুছিয়ে নিতে জানে। নিজের ভালবাসার মানুষটির কি দরকার পিউমণির কাছে আবদার করে। তাতানের নিষ্পাপ চোখের জলটা বলে দেয় সেও ভালবাসার মানুষটির জন্যে পাগল। তাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না।

আর সমু? পারল না তাতানের মতন নিজের ভালবাসাটা উজার করে দিতে? ওর জন্যে অপেক্ষা করে থেকে থেকে উন্নতি কি পেল? চোখের জল? জমানো কষ্টের একটা লম্বা চওড়া ফিক্সড্ ডিপোজিট। যার ম্যাচিউরিটি ভ্যালু বেশ ভারী, আশাতীত।

সমু ঠিক সময় করে নিজের ভালটা বুঝে মৌলীকে নিয়ে কেটে পড়ল। ও ঠিকই করেছে। চলে গেছে। আর গ্রামের সেই বোকা বোকা ছেলেটা?

বাবা যাকে বিশ্বাস করে উন্নতির হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল? সেই সরল, মোলায়েম মুখের ছেলেটা ? যার চোখের পলকে ভালবাসা নেচে বেড়ায়। যার এক চিলতে হাসিতে ভোরের আকাশ টা ধরা পড়ে। হতে পারে তার আর্থিক স্বচ্ছলতা সমুর থেকে অনেক কম। ওর মতন ব্রাইট ক্যারিয়ার তার ছিল না। কিন্তু হৈমন্তিক ধানের মতন সোনালী ভালবাসা তো তার হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল। সময় থাকতে উন্নতি কেন সেটা বুঝল না? বুঝলে হয়ত ...।

অনেক রাত হয়েছে। পরনের নাইটিটা চোখের জলে ভালই ভিজেছে। কিছুটা ঘামেও। ঘামে ভেজা শরীর থেকে একটা গন্ধও বেরোচ্ছে। যে গন্ধটা সমু মুখ ডুবিয়ে আস্বাদন করত। আর আজ...? তাতানের ঘর থেকে পড়ার শব্দ আসছে ভেসে। উন্নতির বাবার কথা গুলো মনে পড়ছে। যখন একা থাকে, কষ্ট হয় মনের মধ্যে, তখন পুরোনো ঘটনাগুলো এলোপাথাড়ি মনে পড়ে।

'উনু মা, আমার কথা শোন। ছেলেটি কিন্তু ভাল। একদম সৎ। তোকে সুখে রাখবে।' বাবা উন্নতির পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলে।

'বাবা, আমি সমুকে লাইক করি। তোমাকে কতবার বলেছি। ওকে আমি ভালবাসি। আমার জীবনের সব কিছু ওর সাথে ম্যাচ করে।' উন্নতি বাবাকে বোঝায়।

'মা, সব বুঝলাম। কিন্তু এই বৃদ্ধ বাপটার কথা একবার ভেবে দেখিস। সারা জীবন আমি থাকব না। একবার ভুল পদক্ষেপ নিলে পরবর্তী জীবনে কষ্টের সীমা থাকবে না।'

'বাবা, সমু ভীষণই ভাল মানুষ। দারুণ বুদ্ধিমান। ভাল চাকরি করছে। দুদিন আগেই বিদেশ থেকে ঘুরে এল। সামনের মাসে আর একটা ভাল চাকরিতে জয়েন করছে।'

'ঠিক কথা। তোর দাদা বলছিল, ও ভীষণ প্রফেশনাল। নিজের সুবিধাটুকু ভালই বোঝে। তাছাড়া ওদের পরিবারকেও ভাল মতন চেনে। ওদের রক্তে বনেদিয়ানা আছে। একটা সময় জমিদার ছিল। বাইরের ঠাঁট, চাকচিক্যটা ঠিক বজায় রাখতে জানে। আমাদের মতন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ও কতটা মানিয়ে নিতে পারবে সেটাই দেখার।

আমার কথাটা একবার ভেবে দেখিস, মা।'

'ওহ! বাবা, তোমাকে না আর বোঝানো যাবে না। এক কাজ কর, ঘরে গিয়ে টিভি দেখ।'

সেদিন বাবার কথা শুনলে উন্নতিকে আজ এতটা বছর একা কাটাতে হত না। সেদিন কিসের জন্যে বাবার পচ্ছন্দ করা ছেলেকে মেনে নিল না? সে নিতান্ত গরীব আর প্রাইমারী স্কুলের চাকরি করে বলে? গ্রামের ছেলে বলেই...? না কি অন্য কোন কারণ ছিল?

ঐ ছেলেটিও কি উন্নতিকে ক্ষমা করতে পারবে? ওর এখন মনে হয় একটা সংসার হয়েছে? বৌ, ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে সংসার করছে। নিজের অজান্তে করা প্রশ্ন গুলো অনেক উওর খোঁজে। আর উন্নতিকে আরো কোণঠাসা করে রাখে।

দেখতে দেখতে রীতির মেয়ে শ্রুতির বিয়েটা ভাল ভাবেই হল। বহু বছর পরে সবার সাথে দেখা হতেই উন্নতির মনটা একটু হালকা হল। একটা ফ্রেশ অক্সিজেনের স্বাদ! দু দুটো দিন কি করে যে আনন্দে কেটে গেল বোঝা গেল না। পুরোনো বন্ধুদের সাথে হৈ চৈ আড্ডা আরো কত কি। হাসি, মজাতে দিনটা গড়িয়ে গেল।

সমু এসেছিল। মৌলীকে নিয়ে বেশ সুখেই আছে। ওদের দুজনকে বেশ মানিয়েছে। সমু তো সব সময় মৌলীর পিছন পিছন ঘুরছে। অথচ দুজনে একসাথে পড়ার সময় ও উন্নতিকে এতটা সময় কখনো দেয়নি। উন্নতি বরং ওর লেজুড় হয়েছে। কলেজে পড়ার সময় যে সামান্যকে দেখেছিল, উন্নতির মনে হয় না এ সেই সামান্য। আদর করে 'সমু' নামে ওই প্রথম ডাকে। কলেজের রঙিন দিনগুলোতে উন্নতির হৃদয় আলো করা সামান্য। নবীন বরণে ওর খোঁপায় গোলাপ রাঙানো সামান্য। আজ সত্যিই সমু ভীষণ, ভীষণ বদলে গেছে।

'শোন না , আমার চাকরি পেতেই আর এক বছর দেরী। সেটল্ড হলেই বিয়েটা সেরে ফেলব। আর কটা দিন। বলছি তো আর কটা দিন।' সামান্য উন্নতির নাকটা চেপে ধরে।

'তাই। আমাকে ভালবাসিস না খুব।'

'এখনও সন্দেহ আছে।'

'না , এমনি বললাম।'

'শোন উন্নি ,বিয়ের দিন আমি কিন্তু ধুতি টুতি পরতে পারব না। আমার ভীষণ লজ্জা করে।' বলেই এক গাল হাসি।

সামান্যর কথাগুলো আজও যেন বুকের মাঝে একটা ধামসা মাদল বাজিয়ে যায়। শরতের মেঘের মতন তারা নীলাকাশে ভাসে। আর মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামায়। সেই বৃষ্টি কতটা সুখের কতটা দুঃখের তা একমাত্র উন্নতিই জানে।

'তুমি', 'তুমি' থেকে কখন যে সম্পর্কটা 'তুই' ' তুই' এ নেমে এসেছে ওরা নিজেরাই জানে না। দুজনের মনের রসায়ন যখন গাঢ় হয়, তখন মনে হয় এমনটাই হয়।

আর এখন বিয়ের রিসেপশনে এ কদিনে এসে সামান্য চেনা ছকের বাইরে। মনের মধ্যে কোথায় যেন টুকরো টুকরো দ্বিধা, দ্বন্দ্বের ছবি। উন্নতিকে দেখে কেমন এড়িয়ে যেতে চায়। বহু দিনের যত্নে লালিত সেই ফেলে আসা 'তুই'টা হারিয়ে গেছে। সেখানে একটা বলিষ্ঠ 'তুমি'র শুধুই অনধিকারচর্চা।

মৌলী সবটাই জানে বোঝে। আর আগে থেকে জানতও। ঐ উন্নতির হাতটা ধরে টানতে টানতে ওকে সামান্যর সামনে এনে দাঁড় করায়। সামান্যর মুখে কথা ফোটে না। হাবা গবার মতন তাকিয়ে আছে। মৌলী একটু চোখের আড়াল হতেই ঠোঁট নড়ে ওঠে।

'কেমন আছ তুমি? কতদিন পরে দেখা, তাই না?'

'আমার কথা নাই বা শুনলে। আগে বল তুমি কেমন আছ?'

'আমি? যেমন দেখছো। তুমি কিন্তু একদম বদলে যাও নি। সেই আগের মতন...'

কথা শেষ হয় না। সামান্য উন্নতির চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পুরোনো অতীতটাকে নিঙড়ে নিচ্ছে। উন্নতি কপাল বেয়ে নেমে আসা সাদা কালো অবাধ্য এলোমেলো চুলগুলো সরাতে ব্যস্ত। একটু দম নিয়ে...

'ছাড় ও সব কথা। তুমি বরং একটু পাল্টে গেছো। আগে কত হাসি মজা করতে। আর এখন...। বুঝেছি...'

'কি বুঝেছ? বলবে না?'

'বলছিলাম মৌ, তোমাকে ভীষণ চোখে চোখে রাখে। তাই হয়ত...'

'তুমি না, একদম বদলাবে না...।

'অ্যাই, শোন না, কফি খাবে?'

'খেলে মন্দ হয় না। সাথে গরম পকোড়া হলে আরও ভাল হয়।'

মৌলী দূর থেকে সব দেখছে। আর মুখ টিপে টিপে হাসছে। ওর প্রতিটা হাসির অণু পরমাণুতে জেগে আছে উন্নতির অন্তর পোড়ানো ব্যথা, কষ্ট। সামান্য হয়ত কিছুটা তার আভাসও পেয়েছে। উন্নতির দুচোখে একটু একটু করে অতি ক্ষীণ নোনা মাতলার জোয়ার জাগছে। আর সেটা বয়সের ধারে ভারে অমসৃণ গাল বেয়ে পরম আদরে আবেগে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে।

বিয়ের পর্বের সদ্য পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে তার টাটকা গন্ধটা গায়ে লেপ্টে আছে। এবার ফেরার পালা। একটু সময় নিয়ে হালকা ঘোরাঘুরি করে, হংকং মার্কেট থেকে ভাইপোর পচ্ছন্দের জিনিস কিনেই তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে অনেক্ষণ অপেক্ষা করছে বাসের জন্যে।

চায়ের কাপ হাতে একটু চোখটা চারিদিকে ঘোরাতেই একটা বিশাল বড় বহুতল নজরে আসল। বহুতলের নামটা জ্বল জ্বল করছে। 'উন্নতি'। তার পাশেই একটা বড় মার্কেট কমপ্লেক্স। সেটারও নাম 'উন্নতি সুপার মার্কেট'। নিজের নামটা এভাবে ব্যবহৃত হতে দেখলে সকলের চোখ টাটায়। উন্নতিও মুচকি হাসল।

একটু একটু করে অন্ধকার বাড়ছে। বাসের দেখা নেই। ভাবছে ট্রেনে ফিরবে। আপনমনে স্টেশনের পথ ধরে একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে কিছুটা হাঁটতেই, হঠাৎ একটা স্করপিও পিছন থেকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওর দিকে ধেয়ে আসছে।

আর একটু হলেই এক্সিডেন্ট হতে পারত। হল না। একটা শক্ত হাত ওকে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে বড় সড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিল।

লোকটি সামান্য চোট পেয়েছে। মাথা ফেটে গেছে। জামা প্যান্টে কাদা। উন্নতিও একটা হালকা ঝাঁকুনি সহ্য করল। কিছুক্ষণ

পরে স্বাভাবিক হয়ে বলল ,

'আপনার ব্যাগটা বাসস্ট্যাণ্ডে ফেলে এসেছিলেন। ব্যাগটা আপনাকে দিতে গিয়েই দেখি আপনার পিছনে একটা গাড়ি ভয়ানক গতিতে ছুটে আসছে। তাই কোন কিছু না ভেবেই...'

লোকটির কথা শেষ হয় না। উন্নতি এক দৃষ্টিতে উনার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে ঘোর বিস্ময়। কিছু বলার ভাষা নেই। উনার চারিদিকে বেশ কিছু মানুষের ভিড়। হতে পারে সবাই উনার পরিচিত। বা নেহাতই পথচারী।

'আপনি কিছু বলছেন না যে? বুঝেছি এখনও ভয় কাটেনি। রিল্যাক্সড্।' লোকটি আবার প্রশ্ন করল।

উন্নতি চুপ করে মাথা নীচু করে আছে। কিছুটা ভয়, কিছুটা দ্বিধা ওকে গ্রাস করছে। একটু মনে হয় লজ্জাও পেয়েছে। লোকটি আবার বলে উঠল।

'কি হল, কিছু বলছেন না যে? কিছু না বললে আমি...'

কথা শেষ না করেই একটু থামল। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে লাজুক স্বরে বলল...

'এই নিন, আপনার ব্যাগ। এবার আমার হাতটা আলতো করে ধরে আস্তে আস্তে চলুন ঐ গাছের নীচে বসা যাক। একটু চা খেলে দেখবেন সব ফ্রেশ লাগবে...'

'আপনি শুধু শুধু কেন আমার জন্যে এতটা কষ্ট করবেন। আমি নিজেই একা...'

'বেশ, তাই যান। আমি তাহলে চলি...'

'এই যে শুনুন...'

'কি?'

'আমি চা খেতে পারি। তবে একটা শর্তে আমাকে স্টেশন অবধি ছেড়ে আসতে হবে কিন্তু...'

'বলছেন, বেশ তাই হবে। এ আর এমন কি...!'

লোকটি উন্নতির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। চোখের কোণে দুর্বল মাঘ শিশিরের চন্দন। ফোঁটায় ফোঁটায় যেন নামছে ভরাট গাল বেয়ে।

তেইশ বছর আগে বাবার দেখা যে ছেলেটিকে পাত্তা দেয়নি , ফিরিয়ে দিয়েছিল সামান্যকে ভালবেসে। সেই ছেলেটিই আজ উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত প্রোমোটার। দুর্নিবার চৌধুরী। উন্নতির জীবন শুধু আজ বাঁচায় নি। প্রথম দেখাতেই উন্নতিকে ভালবেসে ছিল।

আর সে ভালবাসা নিখাদ সোনার মতই পবিত্র। সেইজন্যে ভালবাসার সাক্ষ্য স্বরূপ শহরের প্রাণকেন্দ্রে নিজের ভালবাসার নামে ফ্ল্যাট, মার্কেট তৈরী করে স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছে। ও পারত একটা বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে সুখে থাকতে। সংসারটা মোলায়েম করে সাজিয়ে নিতে। কোন কিছুই করেনি। উন্নতিকে ভালবেসে জীবনে অনেক উন্নতি করলেও নতুন কাউকে ওর জীবনে আনেনি। অবিবাহিত থেকে গেছে।

ভালবাসা চোখে দেখা যায় না। অনুভব করতে হয়। প্রাইমারীর চাকরি করেও একজন সৎ, সফল ব্যবসায়ী। 'সামান্য'রা সব কিছু পেয়ে সব করেও জীবনে অতি 'সামান্য' থেকে যায়। আর 'দুর্নিবার'রা সাধারণ ঘর থেকে এসে জিরো থেকে শুরু করেও ওদের টপকে অনেক উঁচুতে চলে যায়। এখানেই দুজনের হেল এণ্ড হেভেন ডিফারেন্স। উন্নতির চোখ ছল ছল করছে। দুচোখ বেয়ে নামছে শ্রাবণ পূর্ণিমার ইছামতীর ভরা কোটাল।

দুর্নিবার আস্তে করে হাতটা ধরে উন্নতিকে চেয়ারে বসিয়ে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল। দুর্নিবার হাত আর ছাড়েনি। উন্নতি ছাড়তে দিলে তো ? জীবনে একবার ভুল করেছে। আর সে ভুল করতে চায় না।

ছয় মাস কেটে গেছে...

তাতান কি ভাগ্যিস পিউমণিকে জুতো আর জ্যাকেটটা আনতে বলেছিল। তা না হলে ওদের দুজনের এই সুমধুর মিলনটা হত না। দুর্নিবারের সাথে হয়ত কোন দিন দেখায় হত না এ জন্মে। একটা সারা জীবনের আফশোস থেকে যেত। একটা শূন্যতা তৈরী হত আজীবন। আর ভালবাসার নদীতে চড়া পড়ে পড়ে সেটা আরও শুকিয়ে যেত।

আজ সব ক্রেডিট ওর এই আদরের ভাইপোটার প্রাপ্য। ওর জন্যেই সব কিছু ফিরে পেল। আর এই ফিরে পাওয়ার মধ্যেই একটা অপার আনন্দ।

জুতোটা ওর কাজে লাগবে। আর জ্যাকেটটা চোখের জল মুছতে। মাঝে মাঝে ভালবাসা স্মৃতির কুলুঙ্গি দিয়ে উঁকি মারবে।

ওর প্রেমিকা ওকে ছেড়ে দিয়েছে। কিছু দিন আগেই অন্য ছেলের সাথে বিয়ে করে চলে গেছে। প্রেম বাইরে থেকে যতটা মধুর বলে মনে হয়, ভিতরটা ততটাই বেদনাদায়ক... এটা শেক্সপীয়রের কথা। বড় বড় মহাপুরুষ কবি সাহিত্যিকদের কথা কখনো মিথ্যে হতে পারে? মনে হয় না।

সময় আর ঘড়ির কাঁটাকে মান্যতা দিয়ে ওদের চারহাত এক হয়ে গেল। বহুদিন বহু বছরের অপেক্ষার যেন আজ অবসান। সবার আশীর্বাদ আর ভালবাসার পরশে 'চৌধুরী ভিলা' ফুল আর আলোতে সেজে উঠেছে। বিসমিল্লা খানের সানাইয়ের ইমন-কল্যাণে ডুবেছে গোটা এলাকা। দু জনের তরফে বন্ধু বান্ধব সকলেই এসেছে। সামান্য আসতে না পারলেও ওর প্রথম ভালবাসার জন্যে দামী একটা উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে।

আজ দুর্নিবার আর উন্নতির ফুলশয্যা। বহু অপেক্ষা বহু তপস্যার ফল। চাঁদের রূপোর অহংকার জানালা দিয়ে গলে গলে পড়ছে ঘরে, বাড়ির আনাচে কানাচেতে। ঠিক ওদের ভালবাসার মতন।

সবাই ঘুমোচ্ছে। ওরা দু জনই শুধু জেগে। একে অপরকে আদরে ভালবাসায় ভরিয়ে তুলছে। দুটো বহুদিনের বহু বছরের অভুক্ত পিপাসিত শরীর মন পরস্পর পরস্পরকে আলতো ছোঁয়ায় সোহাগের তুলি বুলিয়ে চলেছে অনবরত। সত্যিই ভালবাসা ভীষণই দামী জিনিস।

রাস্তার ওপাশে বট তলায় ক্ষ্যাপা বাউলের গান ভেসে আসছ...

'মিলন হবে কত দিনে ...

.... মনের মানু.....'

উন্নতি আর দুর্নিবারের চোখে তখন একটা নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন। অশ্রু শিশিরের নোনা চন্দন ফোঁটায় ফোঁটায় সঞ্চারিত হচ্ছে নতুন পৃথিবীর শিকড়ে, পল্লবিত শাখায় প্রশাখায়, ছড়ান ডাল-পালায়।

শক্তিরূপেণ আরশোলারা

অরিজিৎ ঘোষ

রাত পোহালেই মহালয়া। কাকভোরেই বাবা রেডিওতে শুনবে বীরেন্দ্র কিশোর ভদ্রের মন মাতানো চণ্ডীপাঠ। ছেলেবেলা কাটিয়ে একটু বড় হওয়ার পর থেকে আর কখনও চণ্ডীপাঠ শোনেনা অনীক। চণ্ডীপাঠের প্রত্যেকটা মন্ত্র, প্রতিটা গানের স্বর ওর মন ব্যাকুল করে তোলে। আগে যখন শুনতো, পুরো সময়টাই অজানা কোনও কষ্টে কেঁদে উঠতো ছেলেটা। অনীক মনে করে মহালয়াতেই আসল দুর্গাপূজার সূচনা, পুজো তো আনন্দের উৎসব! কিন্তু কোথায় সবাই আনন্দে আছে। এই তো বছর দুয়েক আগে দুর্গাপুজোয় বাংলার মানুষ আওয়াজ তুললো, 'উই ডিমান্ড জাস্টিস'। অনীকও অনেকের সাথে মহালয়ার রাতে বিচারের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু বিচার আর হলো কই! বিচারের দাবিকে সামনে রেখে বিরোধী দলগুলো শাসককে করলো কুপোকাত, এবছরের মাঝামাঝি সময়ে পতন ঘটলো ১৫ বছরের তথাকথিত 'মানুষের' সরকারের। কিন্তু তাতে কি হাসি ফিরলো 'ক্রাই অফ দ্য ইয়ার' স্ট্যাচুর মুখে! নতুন সরকারের ভালোবাসা পেয়ে কিছু মানুষ এখন উন্মাদ হয়ে পুরো ভয়হীন ভরসার সাথে যেখানে সেখানে ছুড়ে মারছে ডিম! ফলতঃ বেড়ে গেছে ডিমের দাম। অসহায় দুর্গা মা, যার স্বামী রিক্সা চালিয়ে কোনোমতে ঘর চালায়, সে সামান্য ডিমটুকুও স্কুল ফেরত তাঁর কার্তিক-গনেশের মুখে তুলে দিতে হিমসিম খাচ্ছে। এটাই কি তবে চেয়েছিল রাতের দখল নেওয়া দামাল ছেলেমেয়েরা? এসব ভেবে মাঝে মাঝে নিজের উপরেই রেগে ওঠে অনীক। এখন আর ওর ভালো লাগে না এসব আন্দোলনের নামে ন্যাকামো। ও বুঝে গেছে দলহীন মানুষগুলো আবেগের বশে বিচার চাইবে, পুলিশের মার খাবে আর সেটার ফায়দা নেবে ভোটের নামে প্রহসন করা দলগুলো। বছর দুয়েক আগে যে দল এই দামাল ছেলেমেয়েগুলোকে হিরো বানিয়েছিল আজ সেই দলের কাছে ছেলে-মেয়েগুলো নাকি 'দিমাগী নকশাল'।

হতাশ অনীক এখনও স্বপ্ন দেখা ছাড়েনি। সে দেখে শহর থেকে গ্রামে ঘটে চলা প্রতিটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে যুবক-যুবতীরা। পুলিশের চোখে চোখ রেখে, শাসকের বরাভয়কে উপেক্ষা করে ওরা এখনও রাজপথ কাপিয়ে স্লোগান তোলে 'হাম মাঙ্গে আজাদী' কিংবা 'উই ডিমান্ড জাস্টিস'। তাদের মাথায় নেই কোনও রাজনৈতিক দলের হাত, নেই কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যানার। শাসকের বিরুদ্ধে কখনও তারা আসে 'শহুরে নকশাল' রূপে কখনও বা ফিরে আসে 'আরশোলা' রূপে। অনীক জানে, কাল সকালে পিতৃপক্ষের অবসান ঘটবে, আর দিল্লির রাস্তায় ছড়িয়ে পড়বে লাখো লাখো আরশোলা। অনীক শুনেছে শাসক নাকি আরশোলা মারতে তৈরি রেখেছে যত আরশোলা, তারও বেশী কালো 'হিট'! বন্ধ রেখেছে রেল, মেট্রো পরিষেবাও! তাই ওর মন খুব খারাপ, ও যে 'আরশোলা' খুব ভালোবাসে! সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ঘুমে চোখ বুজে আসে তাঁর। রাতে ঘুমে আচ্ছন্ন অনীক স্বপ্ন দেখছে, ও অবাক চোখে তাকিয়ে মা দুর্গার দিকে। দেখছে মায়ের দুচোখ বেয়ে নেমে আসছে রক্তের স্রোত। ঠিক যেন তিলোত্তমার মতো। হঠাৎ দুচোখ বেয়ে নেমে আসা রক্ত মিলিয়ে জ্বলে উঠলো মায়ের দুচোখ। ভয়ার্ত মায়ের মুখে এখন প্রতিহিংসার ছাপ স্পষ্ট। ঘৃণাভরে মা দেখছে তাচ্ছিল্যভরা অসুরের হাসি। আর মনে মনে ভাবছে এটাই ওর শেষ হাসি। চোখের পলক ফেলতেই অনীক দেখলো অসুর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। ওর ৫৬ ইঞ্চি বুক এফোড়-ওফোড় করে গেঁথে আছে মায়ের ত্রিশূল। রক্তের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে অসুরের সব সৈন্যরা, যারা একদিন সাধারণ মানুষকে পায়ের তলায় পিষে মেরে পেতো ঐশ্বরিক সুখ! অনীকের দুচোখে বেয়ে আনন্দাশ্রু বেয়ে চলেছে অবিরাম। অনীকের চারপাশে এখন আরও কত ছেলে-মেয়ে, তাদের হাতে লাল, নীল, সবুজ পতাকা। তারা মায়ের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, 'বলো দুগ্গা মাইকি, জয়'। শান্ত অথচ দৃঢ় চোখে মা তাকিয়ে আছে অনীকদের দিকে। স্নেহময়ী কণ্ঠে মা বলছে, আয় তোরা কাছে আয়! সবার সাথে সাথে অনীকও মায়ের কাছে গেলো। সবাই নিজের অনুযোগ, অভিযোগ করেই চলেছে। কেউ বলছে তার বোনের সাথে অন্যায়ের কথা, কেউ বলছে তার ন্যায্য চাকরি হারানোর যন্ত্রণার কথা, কেউ মাকে শোনাচ্ছে তার বাড়ির মানুষের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কথা আবার কেউ বলছে প্রশ্ন ফাঁসের কারণে পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা। মণ্ডপের ভিতরে তখন তুমুল হইহট্টগোলের পরিবেশ। অনীক দেখলো, মা হাসিভরা কণ্ঠে মৃদু বকুনি দিয়ে তাদের বলছে, থাম এবার। মায়ের আদেশে সকলে শান্ত হলো। মা বলছে, সমাজে চারদিকে আজ অসুররূপী শয়তান ভরে গেছে, আমি পারবো না তাদের সকলকে শায়েস্তা করতে। তোরা যুবক, তোরাই পথ প্রদর্শক। সুতরাং এ সমাজ তোদেরই বদল করতে হবে। আমি তোদের আশীর্বাদ করি, তোরা সবল হয়ে ওঠ। অনীক দেখলো মায়ের আশীর্বাদে ছেলে-মেয়েরা এক এক করে আরশোলায় রূপান্তরিত হচ্ছে। মানুষের এইভাবে আরশোলায় রূপান্তর হতে দেখে অনীক ভয় পেয়ে গেলো। ভয়ে মণ্ডপ থেকে ছুটে বাইরে চলে এলো।

লাখো লাখো আরশোলা এখন ছুটে চলেছে মাঠে থেকে গ্রাম, গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে। আরশোলারা যত এগোচ্ছে ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে ওদের সংখ্যা। অনীক দেখলো, ওরা এখন দিল্লির রাজপথে, সামনে কালো হিট, দাঁড়িয়ে পুলিশ, তবুও আরশোলারা ভয় পাচ্ছে না। ছুটেই চলেছে ওরা। পুলিসের ছোড়া কালো হিটের স্প্রে ওদের আর হার মানাতে পারছে না। পুলিসের চোখে, মুখে, কানে একে একে ঢুকে পড়ছে আরশোলাগুলো। অনীক অবাক চোখে দেখছে, কালো হিটের বোতল ফেলে দিয়ে পুলিশও ছুটছে আরশোলাদের পিছনে। পুলিসের উর্দি ফেলে এখন যেন ওরাও আরশোলা! হঠাৎ একটা অনেক বড় আরশোলা ধেয়ে এলো অনীকের দিকে, অনীক ভয় পেয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। আরশোলাটা ছুটে এসে ঢুকে গেল অনীকের কানে। অনীকের সারা শরীর কেঁপে উঠলো, ও দেখছে, ওর হাত বদলে আরশোলার ডানায় পরিণত হচ্ছে।

অনীক চিৎকার করে উঠে বসলো, সারা শরীর ঘেমে গেছে, হাত-পা কাঁপছে। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে ও বুঝতে পারলো, ও স্বপ্ন দেখছিল। কাল রাতে এসব ভাবনা থেকেই এরকম স্বপ্ন দেখছে, মনে করলো ও। ওর কানে এলো, পাশের ঘর থেকে বাবার রেডিওতে তখন চলছে মহালয়ার চণ্ডীপাঠ। বীরেন্দ্র কিশোর ভদ্র পাঠ করে চলেছেন, 'যা দেবী সর্বভূতেষু, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা...'!

দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-

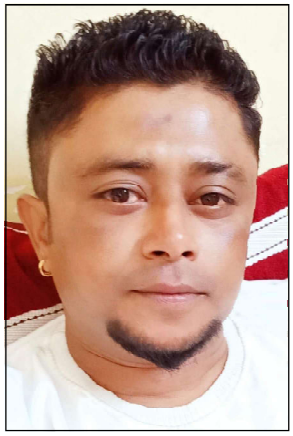


পিয়ালী বোস

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিজেপি কর্মী

১৫নং ওয়ার্ড, অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভা

শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-



সঞ্জয় দে

কর্ণধার,

উপাসনা ফাউন্ডেশান,

কচুয়া মোড়, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

শারদোৎসবের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-



সইদুল হক

উপপ্রধান

বেড়াবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

হাবড়া ২নং ব্লক, উত্তর ২৪ পরগনা

বসুধা

DIGITAL PRESS

পলিমার ষ্ট্যাম্প

ডিটিপি, জেরক্স, কালার জেরক্স, কালার প্রিন্ট, ল্যামিনেশন, ফ্লেক্স প্রিন্ট, পিভিসি কার্ড, ভিজিটিং কার্ড, বিবাহের কার্ড এবং সকল প্রকার আমন্ত্রণ সহ যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয়।

কল্যাণগড় বাজার, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

Phone & WhatsApp No. : 9378265358

email : aghositabidhayak@gmail.com

অবক্ষয়-মানবিকতা-হিংস্রতা

শ্যামল চ্যাটার্জী

বিপিনবিহারি সরকার। একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি। ১০ বছর আগে চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন। সেই হিসেবে ওনার বয়স এখন ৭০ বছর। স্ত্রী বেলা এবং এক পুত্র ও এক কন্যা। চাকরি থাকাকালীনই ছেলেমেয়ের বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে পেরেছেন। নাতি-নাতনি নিয়ে সুখের সংসার। বিপিনবাবু যা অবসরকালীন পেনশন পান তাতে সামাজিকতা, ওষুধপত্র সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক দায়িত্ব সামলে সংসারটা ভালোই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বয়সেও নিত্য বাজারের দায়িত্বটা নিজের হাতেই রেখেছেন।

প্রাত্যহিক কাজকর্ম সেরে দোতলার ব্যালকনিতে বসে সংবাদপত্র পড়া অবসর জীবনের পরদিন থেকেই বিপিনবাবুর নিত্যদিনের অভ্যাস। আজও সকালে পুত্রবধূ সোমা চা হাতে নিয়ে এসে দেখে পেপারটা টেবিলের এক কোণে ভাজ করা অবস্থায় পড়ে আছে। আর বিপিনবাবু একমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'বাবা চা।' পুত্রবধুর ডাকে চমকে ওঠেন বিপিনবাবু। 'কি ভাবছেন, আপনার শরীরটা কি খারাপ লাগছে?' আচমকা সোমার ডাকে হুঁস ফেরে বিপিনবাবুর। বলেন, 'না না, শরীরতো ঠিকই আছে।' 'তাহলে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি এত ভাবছেন?' সোমার প্রশ্নের উত্তরে বিপিনবাবু বলেন, ভাবছি বৌমা, দিনকালের পরিস্থিতি কি হয়ে গেল। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই কিংবা টিভির পর্দায় শুধুই সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি। এই কারণেই টিভির খবর দেখা তো বন্ধই করে দিয়েছি, ভাবছি পেপার রাখাটাও বন্ধ করে দেবো। এত অধঃপতনের খবর আর নিতে পারছি না মা। —কেন বাবা, আপনার ঠিক কি হয়েছে একটু খুলে বলবেন। —কি আর বলবো বল? খবরগুলো দেখি আর শুধুই ভাবি। আমাদের সময়, মানে খুব একটা বেশি দিনের কথা নয়। তখন কত অভাবই না ছিল আমাদের সংসারে। প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই একাধিক সন্তান। একান্নবর্তী পরিবার। কিন্তু সুখ ছিল, শান্তি ছিল অপরিসীম। তখনকার দিনে অভিভাবকদের যৎসামান্য আয়ে সংসার চালাতে গিয়ে হিমসিম খাওয়ার মতো অবস্থা ছিল। কেউ অর্ধাহারে, কেউ বা অনাহারে দিনযাপন করতে বাধ্য হতো। তার মধ্য থেকেও ছেলেমেয়েকে যে যতটুকু পেরেছে শিক্ষিত ও মানুষের মতো মানুষ করার ক্ষেত্রে কোনরকম কার্পণ্যতা রাখেনি। যে মানুষের মধ্যে ছিল মনুষ্যত্ব। সেই শিক্ষা ছিল অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা। ভালবাসা, সামাজিকতা, স্নেহ, দয়া, মায়া ছিল সেই অনাহারজনিত শিক্ষারই অঙ্গ। আর আজ দ্যাখো বেশিরভাগ পরিবারেই একটিমাত্র সন্তান। অভিভাবকদের রোজগার ওই আমল থেকে কয়েক গুণ বেশি। উচ্চ শিক্ষিতদের ছড়াছড়ি। মানুষ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেই মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে কি? সমাজের বুকে প্রতিনিয়ত যুবশক্তির আস্ফালন মনুষ্যত্বহীন মানুষের প্রতিনিয়ত দাপাদাপি প্রত্যক্ষ করছে ভদ্র ও সভ্য মানুষ। বেশভূসা, খাওয়া-দাওয়া বিলাসিতা কোনও কিছুরই অভাব নেই। আজকালকার ছেলেমেয়েরা জানেই না অভাব কি জিনিষ। তাই তাদের শখ পূরণের চাহিদাও গগনচুম্বি। তারপরেও দিকে দিকে অনাকাঙ্খিত ঘটনা অহরহ ঘটেই চলেছে। কোথাও মদ খাওয়ার টাকা না পেয়ে বাবা নয়তো মাকে খুন করে দিচ্ছে সন্তান। কোথাও নেশা করার টাকা না পেয়ে স্বামী নিজের স্ত্রীকে মেরে দিচ্ছে। কোথাও স্বল্প আয়ের স্বামী, স্ত্রীর সব বিলাসিতা পূরণ করতে না পারায় স্ত্রী বাড়িতে কাজ করতে আসা রাজমিস্ত্রির সাথে কখনও টোটো চালকের সাথে, নিজের পেটের সন্তানকে অজানা অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজের সখ-আহ্লাদ পূরণ করার জন্য সংসার ছেড়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে। এসবই এখন সমাজের গা সওয়া অঙ্গ হয়ে গেছে বৌমা। এবার তুমিই বল এগুলো কি সামাজিক অবক্ষয় নয়?

প্রতিদিন খবরের শিরোনামে উঠে আসছে সন্তানসম ছাত্র দ্বারা শিক্ষাগুরু মাষ্টারমশাইকে অপমানজনক আচরণই শুধু নয়, ভয়ঙ্করভাবে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা। কোথাও শিক্ষক কেবলমাত্র তার গুরুদায়িত্ব একজন ছাত্রকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শাসন করার জন্য অভিভাবক বিদ্যালয়ে এসে কোমরের বেল্ট খুলে সমাজের অপরাধীর মতো সেই শিক্ষককে বেধড়কভাবে মারছেন। এ কোথায় চলেছে এ সমাজ। আমরা কি একবারও ভেবে দেখবো না এর পরিণাম পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। আর আমাদের সময় আমাদের অভিভাবকরা স্কুলে ভর্তি করার সময় শিক্ষকদের বলে দিয়ে আসতেন মাষ্টারমশাই ২০৬টা হাড় গুনে গুনে ফেরত দিয়েন। ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ তৈরির দায়িত্বটা আপনাকেই দিয়ে গেলাম। হাড্ডি ফেরত দিলে চামড়া এবং মাংস আমি ঠিক লাগিয়ে নিতে পারবো। কোনদিন স্কুলে মার খেয়ে মন খারাপ করে বাড়িতে এলে মা জিজ্ঞেস করতো, কিরে স্কুলে নিশ্চয়ই মার খেয়েছিস। মার বকুনির কথা বাবার কানে গেলে ঘরের কোনায় যত্ন করে রাখা বেতের লাঠি দিয়ে আরও এক প্রস্থ মার। এই ছিল তখনকার শাসন। মাত্র কিছু বছর আগেও কেউ কখনও শুনেছে শাসন করার জন্য কোনও শিক্ষক ছাত্রদ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন কিংবা কোনও অভিভাবক স্কুলে গিয়ে মাষ্টারমশাইদের শাসিয়েছেন, শোনেনি। কিন্তু সেই অনাকাঙ্খিত ঘটনাগুলো বর্তমান সময়ে অহরহ ঘটেই চলেছে। এই ঘটনাগুলো কি সামাজিক অবক্ষয় নয়? শিক্ষকদের হাতের কঞ্চিটা যেদিন থেকে উধাও হয়ে গেছে সেদিন থেকেই শিক্ষার অবমূল্যায়ন শুরু হয়ে গেছে।

এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের কারণে মানুষ দিনকে দিন অসহিষ্ণু ও হিংস্র হয়ে উঠছে। এখন আর মানুষ প্রতিবেশীর বিপদে পাশে দাঁড়ায় না। বরং কিভাবে প্রতিবেশীর বিপদ বাড়ে সেই কৌশলই করে। এই হিংস্রতা শান্তিপ্রিয় মানুষ প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারছে। তা সে বাসে ট্রেনে যাতায়াতের পথেই হোক কিংবা হাটে-বাজারে বা পাড়ার মোড়ে, চায়ের দোকানে এমনকি নিজের পরিবারের মধ্যেই হোক অহরহ এই

হিংস্রতার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সহিষ্ণুতা, মানবিকতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা এই শব্দগুলো বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গা দখল নিয়েছে লোভ, লালসা, হিংসা, চতুরতা, প্রবঞ্চনা। এইরকম নানা ধরণের কৌশল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। এইগুলি কি সামাজিক অবক্ষয় নয়? উত্তরে এবার সোমা বলে, সবই বুঝলাম বাবা আপনি একদম ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এটাতো তো মানবেন যে, আপনাদের সময়কালের যেসমস্ত শিক্ষকরা ছিলেন, তাদের মত দায়িত্ব ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক কি বর্তমানে আছে? শিক্ষক নিগ্রহ সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু ইদানিং শিক্ষকদের সম্বন্ধেও নানা রকম অশিক্ষাসুলভ আচরণের খবরওতো শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

ওই বিষয়টা আমি আর উত্থাপন করতে চাইছিলাম না মা, তুমি যখন কথাটা তুললে তখন বলি এই সবইতো সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই ঘটে চলেছে। আমার কথাই ধরো। আমি এই বয়সেও যদি কখনও চলার পথে আমাদের বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষককে দেখি নতমস্তকে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। মাষ্টারমশাইও সন্তানস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। এই দৃশ্য এখন বিরল। এখন নিজের বাবা-মাকেই সন্তানরা প্রণাম করে না। এই যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আমাদের সময়ে দশমীর দিন সকাল হলেই প্রথমে বাড়ির গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পরতাম প্রতিবেশীদের বাড়িতে। সেখানেও গুরুজনদের প্রণাম করতাম। আর লক্ষ্য ছিল কে কত বেশি খই-নাড়ু-বাতাসা ও অন্যান্য মিষ্টিদ্রব্য পকেটে ঢোকাতে পারবে। বর্তমান সময়ের ছেলেমেয়েরা অনেকেই হয়তো জানেই না বিজয়া দশমী কাকে বলে। বিজয়া দশমী না জানলেও তারা আরো অনেক বেশি জানে বা বেশি রাখে সারা দুনিয়ার খবর। সৌজন্যে হাতে থাকা মোবাইল। আজকালকার ছেলেমেয়েরা স্বামী বিবেকানন্দকে যতটা জানে তার থেকে অনেক বেশি জানে ফুটবল খেলোয়ার মেসিকে। বাংলার ছেলেমেয়েদের সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে জানার আগ্রহ না থাকলেও মেসি, শাহরুখ, সলমানের জীবনপঞ্জি গড়গড় করে ঠিক বলে দিতে পারবে। আমি বলছি না যে এটা অন্যায়। বিশ্বকে জানা-বোঝার আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই বলে নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-আচার-আচরণকে বিসর্জন দিয়ে। এটা কি সমর্থনযোগ্য? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ছোট্ট শিশুটিও তার মাতৃভাষায় সাবলীল না থাকলেও ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী তো এই সমাজব্যাবস্থাই। অন্যের সংস্কৃতি বা বিদেশি সংস্কৃতি নকল করতে গিয়ে বাঙালি তার নিজের সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে। যে সংস্কৃতি বাঙালির নয় সেই সংস্কৃতি নিয়েই বর্তমান যুব সমাজ মেতে আছে, ইদানিং তা আরোও প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ বিষয়ে বেশি বলতে গেলে আবার রাজনীতির প্রসঙ্গ চলে আসবে তাই আর বললাম না। এই প্রসঙ্গে শুধু স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী উল্লেখ করলাম। স্বামীজী তাঁর 'বাণী ও রচনা' পঞ্চম খন্ড এবং 'আধুনিক ভারত' প্রবন্ধে অন্ধ অনুকরণ ও পরানুকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'হীন কাপুরুষের মত অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন। যখন মানুষ নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে-তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে।.... যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনি তোমাদের মৌলিকত্ব নষ্ট হইবে।' স্বামীজীর এই বাণীর প্রতিফলন বর্তমান সময়ে সমাজের দিকে দিকে প্রতিফলিত হচ্ছে নাকি?

দীর্ঘ সময় শ্বশুর ও পুত্রবধুর কথোপকথন দেখে ভিতর থেকে বিপিনবাবুর স্ত্রী বেলাদেবী এবার সোমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৌমা শ্বশুরের অনেক গল্প হলো। বাপীর তো অফিসে যাওয়ার সময় হয়ে গেল। বুড়োর হাতে ব্যাগটা দিয়ে বাজারে পাঠাও। যাচ্ছি বলে সোমা ব্যাগটা শ্বশুরমশাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, যান এবার বাজারটা নিয়ে আসুন। দাও বলে ব্যাগটা নিয়ে বিপিনবাবু বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। বিপিনবাবুর যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোমা মনে মনে ভাবছে, বাবা পুরানো দিনের মানুষ তাই সামাজিক অবক্ষয়টাই তাঁর মনে গেঁথে আছে। কিন্তু মানবিকতা সম্পূর্ণরূপে এখনও সমাজ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাইতো এখনও অবক্ষয়ের সাথে সাথে মানবিকতার খবরও মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। সমাজে মানবিকতা আছে বলেই এখনও হতদরিদ্র কোনও ব্যক্তি লক্ষ টাকার ব্যাগ ভুল করে ফেলে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার মালিককে খুঁজে নিয়ে ফেরত দেন। এখনও সমাজে অচেনা মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে সমাজের যুবশক্তিই রক্তদান শিবিরগুলিতে নিজের রক্তদান করেন। এখনও এই সমাজেরই কিছু মানুষ আপদে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ান। এখনও শোনা যায় কোনও পুলিশ অভাবি কোনও ছাত্র-ছাত্রী পায়ে হেটে অনেক দূরের স্কুলে যাতায়াত করছে জানতে পেরে নতুন সাইকেল নিয়ে সেই পড়ুয়ার বাড়িতে হাজির হয়ে সেই ছাত্রটির হাতে সাইকেল তুলে দেন। অর্থাভাবে যেন কোনও দরিদ্র ছাত্র পড়াশুনা থেকে বঞ্চিত না হয় সেই জন্য নিজ দায়িত্ব সামলানোর সাথে সাথে কোনও পুলিশবাবু থানার আশপাশের পড়ুয়াদের এক জায়গায় করে টিউশন দেওয়ার মতো খবর উঠে আসে। এইসব ঘটনাগুলো খুবই কম। তাই হয়তো প্রচারের আলোতে আসে না। সামান্য কয়েকটি ঘটনা ঘটলেও প্রমাণ করে মানবিকতা সমাজ থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাইতো সমাজটা এখনও সুন্দর ও সুস্থ আছে। অবক্ষয়, মানবিকতা, হিংস্রতাকে নিয়েই সমাজকে চলতে হবে। এছাড়া বিকল্প পথ এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু একথা বিপিনবাবুকে কে বোঝায়?

ঈশ্বরের চেক

কৃষ্ণেন্দু রায় (শানু)

শান্তনু বাবুর বাড়ির পাশেই বিশাল চত্বর জুড়ে গৌড় মন্দির। মূল মন্দিরের ভিতরে গৌর, নিতাই, রাধাকৃষ্ণ এবং জগন্নাথ বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি রয়েছে। কিছু ছবি টবিও আছে।

মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে 'হরি ছাড়া গতি নাই' জাতীয় কিছু বাণী লেখা। এবং দরজার পাশে একটা মাঝারি সাইজের দানবাক্স। সেটার গায়ে লেখা 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।'

ষাটোর্ধ্ব শান্তনু বাবু নাস্তিক মানুষ। বাড়ির পাশেই যেহেতু মন্দির, কৌতূহলবশত মাঝে মাঝে মন্দিরে যান। ভক্তদের মুখোমুখি হলে 'জয় রাধে' বলে তাঁকে সম্বোধন করলে তিনিও খানিক অপ্রস্তুত হয়ে 'জয় রাধে' বলে ফেলেন।

শান্তনু বাবু ভাবেন মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যতই অর্জুনের সারথী হয়ে পান্ডবদের পরামর্শদাতা হয়ে হিরো হোন না কেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে রাধাই হিরোইন বা মেইন ক্যারেক্টার।

তিনি ভক্তদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন। কখনও দেখেন কোন পুরুষ ভক্ত টানটান হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন, কখনও দেখেন কোন ডিভোর্সী মহিলা হাত জোড় করে প্রেমের ঠাকুর রাধাকৃষ্ণের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন ঝাড়া দশ মিনিট। কিছু অভিযোগ করছেন নাকি কিছু চাইছেন বোঝা যাচ্ছে না। শান্তনু বাবু এসব উপভোগ করেন।

হঠাৎ একদিন মন্দিরের সেক্রেটারি নরেশ বাবু মারা গেলেন। ভক্তদের ভাষায় দেহ রাখলেন। বয়স বেশি হয়নি। চৌষট্টি পঁয়ষট্টি হবে। এর আগেও যিনি সেক্রেটারি ছিলেন তিনিও অল্প বয়সেই মারা গেছেন।

কমিটির লোকেরা শান্তনু বাবুকে এবার সেক্রেটারি হওয়ার জন্য অনুরোধ করে জোর করেই মন্দিরের সেক্রেটারি বানিয়ে দিলেন। নাস্তিক হলেও শান্তনু বাবু কনফিউসড হলেন। মনে মনে ভাবলেন এসব ঠাকুরের চাল নয় তো? তাঁকে হয় ঈশ্বরে আস্থা আনার চেষ্টা নয়তো তাড়াতাড়ি মেরে ফেলার কৌশল।

যাই হোক এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে তিনি মন দিয়ে মিন্দরের দায়িত্ব সামলাতে লাগলেন।

কিছুদিন ধরে শান্তনু বাবু লক্ষ্য করলেন, ইদানিং রঙ্গ আসছে মন্দিরে। দুপুর বেলা যখন ভক্তরা থাকে না, রঙ্গ ওর ভ্যান রিক্সা টাকে বাইরে রেখে মন্দিরে ঢোকে। রঙ্গ পড়াশুনায় খুব ভালো ছিল, বয়স তিরিশের কোঠায়। দেখে মনে হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে। ওর যখন ষোল বছর বয়স, অনেক টাকা পয়সা রেখে বাবা মারা গেল। রঙ্গদের কলকাতায় একটা বাড়ি ছিল, বাবা মারা যাওয়ায়র বছর খানেক বাদে রঙ্গকে দূর সম্পর্কের এক মাসির হাতে দায়িত্ব দিয়ে ওর মা এক অজানা কাজে কলকাতায় চলে গেল। লোকে বলে বাজে কাজ।

এদিকে প্রায় অভিভাবকহীন রঙ্গ পড়ে গেল অসৎ সঙ্গে। উচ্চ মাধ্যমিকে বাজে রেজাল্ট। পড়াশুনা ছেড়ে দিল। বাবার রেখে যাওয়া টাকায় একটা চার চাকার গাড়ি কিনল। এবং বন্ধুদের নিয়ে দেদার ফূর্তি করতে লাগল। সুরা, জুয়া সঙ্গে নারীসঙ্গ শুরু হল। এই এহোস্পর্শে রঙ্গর জীবন নরক গুলজার হয়ে উঠল।

এভাবে রোজগারহীন বিলাসী জীবন যাপন চলতে থাকলে বাবার রাখা সঞ্চিত অর্থ শেষ হতে কদিন লাগে। রঙ্গ এবার মা'র থেকে টাকা নেওয়া শুরু করল। মায়ের তথাকথিত বাজে কাজে ভালোই রোজগার। রঙ্গ চাইলেই টাকা পাঠিয়ে দিত।

এভাবে বছর দুয়েক চলল। হঠাৎ একদিন খবর আসলো রঙ্গর মা আত্মহত্যা করেছে। রঙ্গ পড়ল অথৈ জলে। টাকা নেই, রোজগার নেই। বন্ধুরা একে একে সরে গেল, দুই একটা নারী সঙ্গ ছিল তারাও কেটে পড়ল। সবাই ওকে ছেড়ে গেলেও মদ ওকে ছাড়লো না। রঙ্গও সব হারিয়ে মদকেই একমাত্র সঙ্গী করে নিল।

এরপর শুরু হলো দেনা করা। কিন্তু ফেরত না পেলে মানুষ কতদিন টাকা ধার দেবে। এক সময় তাও বন্ধ হয়ে গেল।

রঙ্গ এবার বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি শুরু করল। প্রথমে গাড়িটা তারপর একে একে ফ্রিজ, আলমারি, টিভি এমনকি এক সময় দরজা, জানলার কপাটও বিক্রি করে দিল। প্রচুর দেনার চাপ এবং দিন রাত হেরোয়িন, মদ খেতে খেতে মাথাটা বিগড়ে গেছিল আগেই, একসময় রঙ্গ পুরো পাগল হয়ে গেল।

এর মধ্যে কোথা থেকে একটা পুরোনো ভ্যান রিক্সা জোগাড় করেছে রঙ্গ। সেটা চালিয়ে আনমনে ঘুরে বেড়ায় আর বিড়বিড় করে কি সব বলে কেউ বোঝে না।

একদিন শান্তনু বাবু বাজার যাচ্ছিলেন। রাস্তায় রঙ্গর সাথে মুখোমুখি হতেই সৌজন্যতাবশত জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো? রঙ্গ হাত দেখিয়ে শান্তনু বাবুকে দাঁড় করালো। তারপর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কাকু সক্রেটিসকে হেমলক বিষ দেওয়া হয়েছিল মারার জন্য এটা আসলে কি? আমাদের এখানে পাওয়া যায়?

শান্তনু বাবু নির্বিকার স্বরে বললেন হ্যাঁ, হ্যাঁ যায় তো। তুমি তো অনেকবার খেয়েছো। তবে তুমি ড্রাই খেয়েছো। সক্রেটিসকে লিকুইড ফর্মে দেওয়া হয়েছিল একটু অন্যভাবে প্রসেসিং করে। আসলে এটা এক প্রকারের গাঁজা গাছ থেকে তৈরি হয়। বলেই হাঁটা লাগালেন বাজারের দিকে।

এই রঙ্গ কিছুদিন ধরে গৌড় মন্দিরে আসছে মাঝে মাঝে, হাতে একটা ফাইল। তার মধ্যে ব্যাঙ্কের কিছু কাগজপত্র। দুপুরে কেউ যখন থাকে না, রঙ্গ দান বাক্সের মধ্যে কিছু একটা ফেলে দিয়ে চলে যায়।

বছরের শেষ দিনে মন্দিরের দান বাক্সটা খোলা হয়। সেই মতো ডিসেম্বরের শেষ দিনে কমিটির আরও কয়েকজনের উপস্থিতিতে শান্তনু বাবু বাক্সটা খুললেন। বাক্সের মধ্যে থেকে বেশ কিছু পঞ্চাশ, কুড়ি, দশ টাকার নোট আর প্রচুর খুচরো পয়সা বেরোলো।

আর দেখা গেল পাঁচটা চেক এবং একটা উইথড্র ফর্ম। চেকগুলোর কোনওটাতে পে-টু গৌরাঙ্গ, কোনওটাতে পে-টু জগন্নাথ বা রাধাকৃষ্ণ লেখা। চেকের ফিগার লেখার জায়গায় এক বা দুয়ের পর এত শূন্য বসানো যে ফিগার লেখার বক্সটা ছেড়ে শূন্য বেরিয়ে গেছে। মানে কোনটা দশ কোটি বা কোনটা কুড়ি কোটি টাকার চেক।

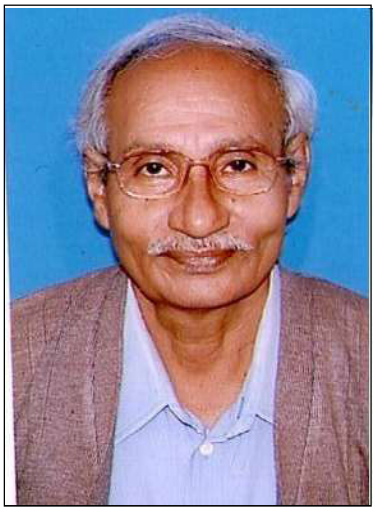
উইথড্রল স্লিপটা খুলে শান্তনু বাবু দেখলেন তাতে মাত্র তিনশ সত্তর টাকা লেখা। শান্তনু বাবু বুঝে গেলেন এ নিশ্চয় রঙ্গর কাজ। তিনি কাউকে কিছু না বলে চেকগুলো পেন দিয়ে কেটে ফাইলে রেখে দিলেন আর উইথড্রল স্লিপটা দলা করে দরজার বাইরে ফেলে দিলেন।

সেদিন দুপুরেই রঙ্গ আসলো মন্দিরে। ভ্যানটা হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে বাইরে রেখে মন্দিরের ভিতর ঢুকলো। ভ্যানের টায়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে। রঙ্গ সাইকেল সারাইয়ের দোকানে গেছিল। দোকানদার বলল, টায়ার চেঞ্জ করতে হবে। তিনশো সত্তর টাকা লাগবে।

রঙ্গ আগের দিন উইথড্র স্লিপ জমা দিয়ে গেছে মন্দিরে। মন্দিরে উঠতে গিয়েই দেখল দরজার পাশে একটা কাগজের দলা পড়ে আছে। উঠিয়ে নিয়ে দেখল, ওর তিনশ সত্তর টাকার উইথড্রল স্লিপটা।

রঙ্গ অবাক হলো। ঠাকুরকে সে কোটি কোটি টাকা দান করেছে। অথচ মাত্র তিনশ সত্তর টাকার উইথড্রল স্লিপটা ঠাকুর ক্যানসেল করল?

রঙ্গ মনে মনে ভাবল, এখন টাকা ডিসবার্সড করার সাইনিং অথরিটি মনে হয় জগন্নাথ দেব, সেই জন্য পাস হয়নি।



শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-

বঙ্কিম চক্রবর্তী (গাছদাদু)

বিশিষ্ট বৃক্ষপ্রেমী

বিজয় ফার্মেসী, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা



শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-

সুশ্রীয়াংশু সেন

বিশিষ্ট সমাজসেবী

১০নং ওয়ার্ড, অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভা

উত্তর ২৪ পরগনা

শৈশবের পুজোর দিনগুলি

প্রদীপ ব্যানার্জি

শৈশবের দিনগুলো এমনই এক মায়াবী সময়, যার স্মৃতিগুলো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে মনে পড়ে। আর সেই স্মৃতির পাতায় যদি কোনো উৎসব সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে তা দুর্গাপূজা। ছোটবেলার পুজোর সেই আনন্দ, উত্তেজনা, অপেক্ষা আর পাড়ার সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাটানো দিনগুলো আজও মনে পড়লে মনটা কেমনযেন নরম হয়ে যায়।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই শুরু হয়ে যেত পুজোর জন্য এক বিরাট অপেক্ষা। মনে হতো, কবে ছুটি পড়বে, কবে প্যান্ডেল বাঁধা শুরু হবে, কবে মা দুর্গা আসবেন! পাড়ায় প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হলেই আমাদের আনন্দের আর শেষ থাকত না। প্রতিদিন প্যান্ডেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ কতদূর এগোল, তা দেখতাম। তারপর শুরু হয়ে যেত কাউন্টডাউন;'পুজো আসছে, পুজো আসছে।'

অবশেষে আসত সেই কাঙ্ক্ষিত মহালয়া। ভোররাতে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সবাই মিলে রেডিওর সামনে বসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-র কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শুনতাম। তাঁর সেই গম্ভীর, মায়াময় কণ্ঠস্বর শুনলেই মনে হতো, সত্যিই যেন মা দুর্গার আগমনের সূচনা হয়ে গেল। মহালয়ার সেই ভোর আজও আমার কাছে এক অদ্ভুত আবেগের নাম।

তারপর আসত পঞ্চমী। পাড়ার সবাই মিলে ঠাকুর আনতে যাওয়ার আনন্দটাই ছিল আলাদা। রাস্তায় কত কিছু কিনে খাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে হৈচৈ করা, আর শেষে মাকে নিয়ে এসে পাড়ার প্যান্ডেলে স্থাপন করা;সব মিলিয়ে সে ছিল এক পরম আনন্দের মুহূর্ত।
এরপর শুরু হতো সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমীর তিনটি দিন। সকাল হলেই যেন আমাদের ঠিকানা হয়ে যেত পাড়ার প্যান্ডেল। সারাদিন সেখানে পড়ে থাকতাম। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, খেলাধুলো, পুজোর আনন্দ আর প্যান্ডেলের ভোগ;সবকিছুতেই ছিল এক অদ্ভুত তৃপ্তি। খাওয়া-দাওয়ার কোনো চিন্তাই থাকত না; পুজোর আনন্দেই পেট এবং মন দুটোই ভরে থাকত।
দেখতে দেখতে এসে যেত দশমী। সেদিন মায়েদের সঙ্গে থাকতাম দেবী বরণের সময়। নিজের বই-খাতা মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে আশীর্বাদ নেওয়ার সেই মুহূর্ত আজও মনে আছে। তারপর শুরু হতো বিসর্জনের প্রস্তুতি। পাড়ার সবাই মিলে শোভাযাত্রা করে যেতাম মাকে বিদায় জানাতে।

কিন্তু বিসর্জনের মুহূর্তটি ছিল ভীষণ কষ্টের। এতদিনের আনন্দ, এতদিনের অপেক্ষা, এত আপন করে পাওয়া মাকে আবার বিদায় দিতে হবে;এই ভাবনাতেই দুচোখ জলে ভরে উঠত। মনে হতো, আবার একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে মায়ের জন্য। ছোট্ট মনে সেই অপেক্ষাটাও যেন ছিল এক বিশাল শূন্যতা।
তবে দশমীর পরের দিন আবার শুরু হয়ে যেত অন্যরকম আনন্দ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবাই মিলে বিজয়া দশমী পালন করতাম। বড়দের প্রণাম, ছোটদের আশীর্বাদ, মিষ্টিমুখ আর সকলের সঙ্গে দেখা করা; সব মিলিয়ে বিজয়ার দিনটিও হয়ে উঠত ভালোবাসা আর মিলনের উৎসব।

আজ জীবন অনেক বদলে গেছে। পুজো এখনও আসে, আলোয় সাজে শহর, প্যান্ডেল হয়, ঢাক বাজে। কিন্তু কোথাও যেন হারিয়ে গেছে সেই ছোটবেলার সরল আনন্দ, সেই অগাধ অপেক্ষা, সেই পাড়ার একসঙ্গে থাকার অনুভূতি। তাই আজও শরতের আকাশে কাশফুল দোলে, ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসে কিংবা মহালয়ার চণ্ডীপাঠ কানে বাজে;মনে হয়, ফিরে যাই সেই ছোটবেলার দিনগুলোতে।

সেই দিনগুলো হয়তো আর কখনও ফিরে আসবে না। কিন্তু স্মৃতির পাতায় তারা চিরকাল অমলিন হয়ে থাকবে। কারণ ছোটবেলার পুজো শুধু একটি উৎসব ছিল না;সেটি ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে নির্মল আনন্দের দিনগুলোর একটি।



দুর্গাপুজোর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-



গোপাল নন্দী

প্রবীণ বিজেপি নেতা

অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

খবরের নেপথ্যে

বিক্রম পাল

(ভোরের আলো ফোটার আগের একটি ঘর। পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলেটি বাবার আঙুল ধরে আধো-আধো গলায় কথা বলছে।)
ছেলে: বাবা, আজ আমার জন্য কী আনবে বলো?
আর কখন ফিরবে রাতে?
জানো তো বাপি, তুমি যখন দেরি করো,
মা আর ঠাম্মা দুজনেই কেমন কেঁদে ওঠে! চিন্তা করে।
বাবা (সাংবাদিক): খুব তাড়াতাড়ি ফিরব সোনা, এখন আসি বাবু!
এই বলে কপালে একটা চুমু খেয়ে বেরিয়ে পড়ে সে।
শুরু হয় এক অন্তহীন লড়াই, আজকের খবর জোগাড়ের তাড়া।
(বদলায় শহর থেকে গ্রাম, রাজপথ থেকে জনসমুদ্র)
প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষের ভিড়ে ওদের পথ চলা।
কখনও কোনো ঘরহারা মানুষের কান্নায় বুক ভেজে,
কখনও মাঝরাস্তায় ঝরে যায় তাজা প্রাণ,
কখনওবা কোনো শিশুর উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ নাড়িয়ে দেয় তাদের ভেতরটা।
এই বিভীষিকাগুলোই ওরা তুলে আনে আমাদের চোখের সামনে।
খবর কি একটু বদলাবে?
তাহলে যে চ্যানেলের টিআরপি হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাবে!
উপরতলার ভর্ৎসনা, আর সামান্য ভুলে জনগণের রোষানল;
সব মাথায় নিয়ে ওদের চলতে হয় কাঁটায় ভরা পথে।
খরা, বন্যা, বজ্রপাত;প্রকৃতির চোখ রাঙানিও ওদের থামিয়ে রাখতে পারে না।
কারণ, ওরা থেমে গেলে যে অন্ধকারের মধ্যে পথ হারাবে সাধারণ মানুষ!
কখনও বিশাল জনসভার রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা,
তবুও খবরের একটু টুকরো পাওয়ার আশায় দিন কেটে যায়।
(সমালোচনার ঝড় আর পর্দার আড়ালের সত্যি)
টিভি স্ক্রিনে যখন আমরা বসে দেখি লাইভ টেলিকাস্ট,
ওদের সামান্য মাথা নাড়ানোর ভঙ্গি দেখে আমরা হাসি, মশকরা করি। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখি ওই পর্দাটার পেছনের সত্যিটা?
ওরা তো নিছক কোনো 'রোবট' নয়!
ওদের জীবনের মূল্য কি কেবল কয়েকটা টাকার বেতনেই মাপা যায়?
ওরা নিজেরাও জানে না, আজ বাড়ি থেকে বেরোলে সুস্থ শরীরে ফিরতে পারবে কিনা।
বন-বাদাড়, নদী-সমুদ্র, কিংবা মৃত্যুর চিতার পেছন পেছন ছুটে চলা; হাসপাতাল চত্বরের বারান্দায় ঘুরে আপডেট নেওয়া; সবটাই তো আমাদের ঘরের আরামটুকু নিশ্চিত করার জন্য।
ওরা মৌমাছির মতো হাড়ভাঙা পরিশ্রমে কুড়িয়ে আনে একেকটি খবর, যাতে আমরা সবার আগে সবটা জানতে পারি। তাই, ওদের স্রেফ 'বেতনভোগী কর্মচারী' ভেবো না।
তোমার বাড়ির ছেলেটা যেভাবে কষ্ট করে নিজের জায়গা তৈরি করেছে, ঠিক সেভাবেই রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে তবেই ওরা এই জায়গায় পৌঁছেছে।
ওরা দেশের প্রথম সারির অদৃশ্য যোদ্ধা। প্লিজ, একটু সম্মান দিও ওদের পরিশ্রমকে, কারণ, ওদের এই কাজ শুধু পেটের দায়ে নয়, এ যে প্রাণের চেয়েও প্রিয় এক ভালোবাসার লড়াই!



শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-



সুবীর চন্দ
বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক
অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

ভাইরাল ভাইরাস

উৎপল ব্যানার্জী

আজকাল বিখ্যাত হতে মেধা লাগে না। লাগে একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন আর ভাইরাল হওয়ার অদম্য খিদে। সামাজিক মাধ্যমে এখন একটাই মন্ত্র ভাইরাল হতে হবে। আর ভাইরাল হওয়ার এই অসুস্থ প্রতিযোগিতাই জন্ম দিচ্ছে এক নতুন সামাজিক ব্যাধির। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি আর নিছক বিনোদন নয়, এটি একটি মারাত্মক বিপজ্জনক মানসিক প্রবণতা। ভিউ, লাইক আর শেয়ারের জন্য আমরা যা করে চলেছি, তা আর কন্টেন্ট নয়, কন্টেন্টের নামে আত্মঘাতী প্রবণতা। যা আর কোনও নির্দিষ্ট প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কিশোর-কিশোরী থেকে বয়স্ক বয়স্কারা পর্যন্ত কমবেশি সবাই এখন এই অসুখে ক্রমশ আক্রান্ত হয়ে পড়ছে নিজেদের অজান্তেই।

'গুড মর্নিং বন্ধুরা, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম' থেকে 'আজ বরমশাই-এর সঙ্গে ঝগড়া হলো' বা 'দেখো বিছানার চাদরটা কেমন হলো'—এই সবকিছুই এখন কন্টেন্ট। রেস্টুরেন্টে টেবিলে খাবার পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ক্যামেরা ঝলসে ওঠে। তার মানে খাবার এখানে গৌণ। মুখ্য হলো আমরা এখন কি খাচ্ছি সেটা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া। এইভাবে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, অন্তরঙ্গ দৃশ্য, শিশুকে বা পোষ্যটিকে স্নান করানো, এমনকি শ্বশুরবাড়ির অশান্তিও এখন লাইভে বিক্রি হচ্ছে। ভিউ বাড়াতে শিশুকে কাঁদানো, মারধর করা, কৃষ্ণ সাজানো সবই করা হচ্ছে ব্লগিং নাম দিয়ে। এইভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে পণ্য বানিয়ে নিজের শোবার ঘর পর্যন্ত হাট করে খুলে দেওয়া হচ্ছে খোলা বাজারে। একবারও আমরা ভাবছি না, সমাজমাধ্যমে শেয়ার করা কোনও কিছুই মুছে ফেলা যায় না। পাশাপাশি অন্যের সাজানো গোছানো 'পারফেক্ট লাইফ' দেখে সাধারণ মধ্যবিত্ত বা প্রান্তিক মানুষের মধ্যেও বাড়ছে হতাশা ও অবসাদ।

ভ্রমণ আগে ছিল নিজের অন্তরাত্মাকে প্রকৃতির মাঝে খোঁজা। এখন হয়ে গেছে অন্যকে দেখানোর প্রতিযোগিতা। এই প্রবণতাটি সবচেয়ে ভয়ংকর। কারণ পৃথিবীর সুন্দর অথচ বিপদসংকুল স্থানগুলি এখন আর ভ্রমণের জায়গা নয়। মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করার স্টুডিও। চলন্ত রেলগাড়ি, পাহাড়ের গভীর গিরিখাত, সমুদ্রতটের অজানা অচেনা নিষিদ্ধ চোরাবালির স্থান সবই এখন শেয়ার করা হচ্ছে ফ্যান ফলোয়ার্স বাড়ানোর জন্যে। এতে দুর্ঘটনায় নিজেও মারা যাচ্ছেন, অন্যদেরও উৎসাহিত করা হচ্ছে এই ধরনের প্রাণঘাতী রিলস বানানোর জন্যে। প্রতিদিন এই ধরনের দুর্ঘটনার খবর আমরা দেখছি সংবাদপত্রে অথবা টেলিভিশনের পর্দায়। যদি সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়, দেখা যাবে প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে কতশত মানুষ স্রেফ আত্মঘাতী হচ্ছে এই মারণ খেলায়।

এরপর আসে আর একটি জনপ্রিয় বিষয় 'ফুড ভ্লগিং'। শুরুটা ছিল নিতান্তই নিরীহ। এর মানে ছিল ভালো খাবারের সন্ধান দেওয়া। সেটা এখন বদলে গেছে চরম অসুস্থ এক প্রতিযোগিতায়। অর্থের বিনিময়ে ভুয়ো 'রিভিউ' দিয়ে প্রায় অচল একটি খাবার দোকানকেও প্রায় পাঁচতারা হোটেলের ক্রমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই মুহূর্তে দোকানে বিক্রি বাড়ছে। কিন্তু একই কন্টেন্ট তো বেশিদিন চলবে না। তাই একই ধরনের আর একটি দোকানদারকে টার্গেট করা হচ্ছে। এর ফলে খাদ্যের গুণগত মান কতটা বাড়ছে তার সঠিক পরিমাপ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। মাত্র ৬০ টাকার বিরিয়ানী ভাইরাল হচ্ছে। ওই খাবারের গুণগত মান কতটা স্বাস্থ্যসম্মত, আমরা কেউ ভেবে দেখছি না। এর ফলে ঘটছে মারাত্মক স্বাস্থ্যহানী। বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি। অতি সম্প্রতি এক তরুণী গৃহবধূ একটি জনপ্রিয় মিষ্টির দোকানের লাড্ডু কিনে এনে তাতে পোকা মিশিয়ে সমাজ মাধ্যমে তার কন্টেন্ট ভাইরাল করে দিলেন। এখানেই শেষ নয়, তার পরে সেই দোকানের মালিকের সঙ্গে রফা করতে গেলেন বেশ কয়েক হাজার টাকা ও একটি আই ফোনের বিনিময়ে। সেই ভিডিওটি মোটামুটি ভাইরাল। দেখলাম তরুণী মায়ের ঘরে একটি শিশু খেলা করছে। না পাওয়ার যন্ত্রণা, সমীহীন আকাঙ্ক্ষা আজ আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে!

প্রযুক্তি আমাদের হাতে ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা সঠিকভাবে ব্যবহারের বোধ দেয়নি। ভাইরাল হওয়া হয়তো খারাপ নয়। কিন্তু তার জন্যে নিজের বংশপরিচয়, শিক্ষা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য আর জীবনকে বাজি রাখা একপ্রকার মূর্খতা। অ্যালগরিদম আজ আপনাকে মনে রাখবে, মনে রাখাবে; কিন্তু কাল ভুলে যাবে। আপনার একটি কন্টেন্ট, একটি ভুল শেয়ারের দাগ আপনাকে ও আপনার পরিবারকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। যার ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক কালে আমরা দেখেছি অসংখ্য তথাকথিত জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েনসার অথবা কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের স্বেচ্ছা মৃত্যু।

বর্তমান বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী বলে চলেছেন, দয়া করে সারা দিনে 'স্ক্রিন টাইম' কমান। অর্থাৎ মোবাইল দেখার সময় কমান। কারণ, এর কার্যকারিতা নীরবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে মানব শরীরে। অনিদ্রা, রাগ, একাগ্রতাহীনতা, হজমের গোলমাল, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগব্যাধি ঘাঁটি গাড়ছে আমাদের শরীরে।

পরিশেষে বলি, সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। উৎসব মানেই আনন্দ, জীবনের কলরব। দীর্ঘক্ষণ প্যান্ডেলে লাইন দিয়ে গলদঘর্ম হয়ে মন্ডপে প্রবেশ করে নিজের দুচোখ দিয়ে প্রাণভরে মাতৃদর্শন করুন। মৃণ্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ প্রত্যক্ষ করুন হৃদয় দিয়ে, মোবাইল ফোনের ক্যামেরার ঝলকানি দিয়ে নয়। মনে রাখবেন জীবনের চেয়ে লাইক শেয়ার ভিউস কখনওই বড়ো হতে পারে না।

শতবর্ষে ভূপেন হাজারিকা ও তাঁর গান

পাঁচুগোপাল হাজরা



জন্ম তার আসামে।পরে আমাদের প্রিয় শহর কলকাতার সঙ্গেও তার আত্মিক যোগাযোগ তৈরি হয়। ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃতির সুর আর অসমীয়া সংগীত জগতের সান্নিধ্য তার মনোজগৎ আচ্ছন্ন করে ফেলে। অন্যদিকে গভীর পড়াশোনার ব্যপ্তি তাকে একাধারে গায়ক, কবি, গীতিকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, লেখক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব করে তোলে। গানে ও লেখায় বলেন মানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের কথা। নিউইয়র্কে থাকাকালীন পল রোবসনের সান্নিধ্য তার সঙ্গীত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। রোবসানের ওল্ড ম্যান রিভার থেকেই তৈরি হয় তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি বিস্তীর্ণ দুপারের। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁর গান শুনে বড় হয়েছে। তাঁর গানের কথাতে ধ্বনিত হয়েছে দয়া, সামাজিক ন্যায়বিচার, ঐক্য এবং গভীর আত্মিক যোগাযোগ। আসাম থেকে এমন এক কণ্ঠস্বর উঠে এসেছে যা সীমানা ও সংস্কৃতির বন্ধন পেরিয়ে মানবতার চেতনা সঙ্গে নিয়ে কালজয়ী নদীর মতো প্রবাহিত হয়েছে। যাকে নিয়ে এত কথা তিনি মনের সঙ্গে গানের সেতুবন্ধন করেছেন। তিনি আমাদের ভীষণ প্রিয় সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা। এবছর তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কর্মযজ্ঞ চলছে সারা দেশ জুড়ে। এমনকি দেশের বাইরেও। ভূপেন হাজারিকা বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটেছেন। কিন্তু তার শিকড় ছিল আসামের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। স্থানীয় সমৃদ্ধ কথকথার ঐতিহ্য লোকসুর এবং জনগণের গল্প বলার অভ্যাস তাঁর শৈশবকে ঘিরে রেখেছিল। এসব অভিজ্ঞতাই তাঁর শৈল্পিক শব্দ ভান্ডারের ভিত্তি গড়ে তোলে। তিনি সব সময় আসামের নিজস্ব পরিচয় এবং সেখানকার মানুষের মূল্যবোধ ধারণ করে চলতেন। খুব অল্প বয়সেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি এক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের পর অহমিয়া সাহিত্যের পথিকৃৎ লক্ষ্মীনাথ বড়ুয়ার নজরে আসেন। কিশোর বয়সে নিজের প্রথম গান রেকর্ড করেছিলেন। যা এক ইতিহাস। সংগীত ছিল তার ব্যক্তিত্বের একটি অংশ মাত্র। দেশের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল অবর্ণনীয়। তাঁর জীবনযাত্রা এক শ্রেষ্ঠ ভারত এর চেতনার শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ। তাঁর লেখাপত্র ভাষাগত ও আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করে সারা দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। আসাম, বাংলা এবং হিন্দি ভাষায় চলচ্চিত্রের জন্য সুরারোপ করেছেন ঠিকই, তবে নিজের প্রদেশ তথা আসামকে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন গর্বভরে।

শতবর্ষ পরে আজ বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে, ভূপেন হাজারিকা তাঁর নিজের হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ,চেতনাতে নজরুল। তাইতো তার কণ্ঠে অমরত্ব লাভ করে, মানুষ মানুষকে পণ্য করে/ মানুষ মানুষকে জীবিকা করে /পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে/ লজ্জা কি তুমি পাবে না? আসলে প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন যাযাবর। তাঁর নিজেরই স্বগতোক্তি ছিল, রঙের খনি যেখানে দেখেছি রাঙিয়ে নিয়েছি মন। তবে হিংসা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি বারবার গর্জে উঠেছেন। আসামের বঙ্গাল খেদা আন্দোলনের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী।

পূর্ব পাকিস্তানে ৭১-এ সংগঠিত গণহত্যার বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছিলেন তিনি। গেয়েছিলেন সেই মানবতার গান। আমাদের প্রিয় শহর কলকাতার প্রতি তার ছিল আলাদা একটা আকর্ষণ। কলকাতাকে নিয়ে তিনি গেয়েছিলেন, চোখের মনি কলকাতা/ জ্ঞানের খনি কলকাতা/ চিরন্তনী এই শহরে আছে মানবতা। তবে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা পেতে তাঁকে কম লড়াই করতে হয়নি।

সেই সময় বাংলা সংগীত জগতের অন্যতম মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রমরমা চলছে। দাপট তখন সলিল চৌধুরীরও। তবু অন্য ধরনের গান, অন্য ধরনের সুর দিয়ে বাঙালির হৃদয়ে জায়গা করে নেন ভূপেন। কলকাতাও আপন করে নেয় তাঁকে। মানবতার পূজারী ছিলেন। তাই গেয়েছিলেন, আর ফুল নয়। আর মালা নয়, নয় ফাগুনের কোনও কাব্য। শুধু মানুষের কথা ভাববো। আর জীবন দিয়েও সেটাই গেয়ে গিয়েছেন তিনি। তাঁর অগণিত গান আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। আমি এক যাযাবর কিংবা আজ জীবন খুঁজে পাবি কিংবা প্রতিধ্বনি শুনি কিংবা গঙ্গা আমার মা কিংবা সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত, কখনো তো হই নাই ক্লান্ত। অসংখ্য গান যেমন: দোলা ও দোলা কিংবা এ কেমন রঙ্গ জাদু কিংবা ও মালিক সারা জীবন কিংবা একখানা মেঘ ভেসে এলো, আসলেই ভীষণভাবে প্রাণের শিল্পী হৃদয় শিল্পী মানবতার পূজারী ছিলেন ভূপেন হাজারিকা। বিস্তীর্ণ দুপারের শ্রোতারা তাঁর অপেক্ষায় থাকতেন। আজও থাকবেন। ২০১১ সালে ভূপেন হাজারিকার প্রয়াণের পর দূরদর্শনে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর শেষকৃত্যের সাক্ষী থেকেছিলেন, ভিজেছিল অগণিত দর্শক শ্রোতার চোখ, তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের মতো মৃত্যুতেও তিনি মানুষকে একত্র করেছিলেন। তাই ব্রহ্মপুত্র উপকূলের পাহাড়ে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়া ছিল যথাযথ সিদ্ধান্ত। অতি আনন্দের বিষয় যে, আসাম সরকার ভূপেন হাজারিকা সাংস্কৃতিক ট্রাস্টের কাজকে সমর্থন করছে। এই ট্রাস্ট তরুণদের মধ্যে তাঁর জীবনযাত্রাকে জনপ্রিয় করার কাজ করছে। ভারত সরকার এবং দেশবাসী সংগীত জগতে তার বিশাল অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, দাদা সাহেব ফালকে-সহ আরও অসংখ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন ভূপেন হাজারিকা। ২০১৯ সালে তাঁকে ভারতরত্ন প্রদান করা হয়। ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প ঢোলা এবং সাদিয়ার মধ্যে যোগাযোগকারী সেতুটি ভূপেন হাজারিকার নামাঙ্কিত। তাঁর সঙ্গীত

যেমন বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মনের যোগ্যসূত্র. এই সেতু তেমন যুক্ত করেছে বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন মানুষকে। ভূপেন হাজারিকা কোনদিনই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তবু প্রবলভাবে যুক্ত ছিলেন সামগ্রিক জনসেবায়। মানুষের জন্য মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক আকাঙ্ক্ষা, তাঁর হৃদয়ে অবস্থান করত। তাইতো ১৯৬৭ সালে আসামের নাও বউচা নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্দল বিধায়ক হিসেবে তিনি নির্বাচিত হন। এ থেকেই বোঝা যায় তাঁর ব্যক্তিত্বে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস কতটা ছিল। মানবতার পূজারী ছিলেন। তাই গেয়েছিলেন, আর ফুল নয়, আর মালা নয় / নয় ফাগুনের কোন কাব্য। শুধু মানুষের কথা ভাববো। ভূপেন হাজারিকার সঙ্গীতের মুগ্ধ শ্রোতারা তাঁকে ও তাঁর গানকে হাতিয়ার করে আজও গেয়ে চলেছেন, জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয় ছুটে ছুটে আয়।





শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন —

Avijit Ritu Bakshi

Saxophone & Flute Artist

অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন

M : 9332155227

বিশেষ প্রতিবেদন

নিজের সৃষ্টি সংগীত অ্যালবাম ‘দেশ আমার’-এর সরকারি স্বীকৃতি চান ঢুলি বিমল নন্দী

অমর চক্রবর্তী



উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর কল্যাণগড়ের নট্টপাড়ার সেই কৌলিন্য এখন আর নেই। শোনা যায়, ঢোল সম্রাট ক্ষিরোদ নট্টের স্মৃতিবিজড়িত নট্টপাড়ায় সন্ধে হলেও মুখরিত হয়ে উঠত ঢোল, সানাই, বাঁশি, তবলা আর হারমোনিয়ামের শব্দে। প্রখ্যাত যাত্রাদল নট্ট কোম্পানি এদের হাতেই তৈরি। কিন্তু বাম জমানায় কোনও সম্মান মেলেনি নট্টদের। অনেকেই পেটের টানে নিজেদের শিল্পকলা ছেড়ে রিকশা, ভ্যান টানেন। তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম জগবন্ধু মিউজিক্যাল ব্যান্ডের কর্ণধার বিমল নট্ট। তিনি একজন বাদ্যশিল্পী। প্রবল দেশাত্মবোধের আকর্ষণে ষাট ছুঁই ছুঁই বিমলবাবু নিজের শেষ সম্বল বসতবাড়ি বিক্রি করে ‘দেশ আমার’ নামে একটি সংগীত অ্যালবাম তৈরি করেছেন। সাধারণ, প্রচলিত দেশাত্মবোধক সংগীত নয়, ওঁর তৈরি অ্যালবামে জাতীয় ধ্বনি বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ, জাতীয় বাণী ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’, সুভাষ বসুর বাণী ‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব’-সহ বিভিন্ন মনীষীদের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। পাশাপাশি দেশাত্মবোধক সংগীত ব্যান্ডবাদ্যের মাধ্যমে সুর ও তালের মূর্ছনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে যন্ত্রসংগীত সমৃদ্ধ ‘দেশ আমার’ অ্যালবাম সাড়া ফেলেছে রাজ্য জুড়ে।

দেশাত্মবোধক অ্যালবামটি ইতিমধ্যেই কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে পাঠিয়েছেন তিনি। অসুস্থ হওয়ার আগে কংগ্রেস নেতা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিমলবাবুর উদ্যোগকে। প্রশংসাবাণী-সহ চিঠি পেয়েছেন তাঁর। সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। তারপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ি বিক্রি করে এখন ভাড়াবাড়িতে থাকেন বিমলবাবু। তবু স্বপ্ন দেখেন। যে করেই হোক দৃশ্যায়িত করবেন নিজের যন্ত্রসংগীতের অ্যালবাম।

তৃণমূল সরকারের আমলে লোকশিল্পী ভাতা পেতেন। এখন বন্ধ। নতুন সরকারের আমলে ওই ভাতা চালু হয়নি। বিমলবাবু হার্ট এবং নার্ভের অসুখে দীর্ঘদিন ভুগছেন। অভাবে তাড়নায় ঠিকমতো ওষুধ কিনে খেতে পারেন না। পাশাপাশি পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও তাকে অন্যান্য ভাইবোনেরা বঞ্চিত করেছে বলে অভিযোগ। অশীতিপর এই বৃদ্ধ তাঁর সৃষ্টির স্বীকৃতি চান রাজ্য সরকার তথা ভারত সরকারের থেকে।

তাঁর তৈরি দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের স্বীকৃতির জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও তিনি কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও তরফ থেকে তাঁকে উত্তরটুকু দেওয়া হয়নি। এখন এই যন্ত্রণা নিয়েই দোরে দোরে ছুটে বেড়াচ্ছেন অসুস্থ ঢাকি বিমল নন্দী।

শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-



মৃন্ময় ব্যানার্জী

বিশিষ্ট শিক্ষক এবং সমাজকর্মী

হরিপুর, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন—



অরূপ দত্ত

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিজেপি নেতা

১১নং ওয়ার্ড, অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভা

বার্ধক্য

দিলীপ রায়

—না, আপনার মনে হয় হবে না।

পেনশন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে বলল সমর। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মী সমরের চোখে চোখ রাখলো অনি। সমর বলল, 'শেষ যে হাউজে কাজ করেছেন, তার একটা প্রমাণ তো লাগবে! ওরা লিখেটিখে দেবে না?'

অনি একটু বিরক্ত হয়, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করে না। গলায় বিনয় রেখে বলে, যেদিন এই ফর্মের জন্য এসেছিলাম সেদিনই তোমায় জানিয়েছি যে, আমাদের এই পেশায় কোনও সংস্থাই অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার দেয় না। এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেটও পাওয়া যায় না। আমরা অফার লেটার, জয়েনিং লেটার বা বড়জোর প্রেস আইডেন্টিটি কার্ড পাই। তুমি বলেছিলে আপনার যা যা ডকুমেন্টস আছে তাই দিয়ে অ্যাপ্লাই করুন। সেইমতন ৩০ বছরের সাংবাদিকতা জীবনের যা ডকুমেন্টস সংগ্রহে ছিল তা এই অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি। এরপর না হলে কি আর করা যাবে!

—ঠিক আছে। আমরা আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলি নবান্নে পাঠিয়ে দেব, এরপর যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অফিসাররা নেবে, আমার মনে হলো তাই বললাম। একথা বলে অনির অ্যাপ্লিকেশন জমা নিয়ে নেয় সমর।

তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে আসে অনি। সঙ্গে দুই সহকর্মী মলয় মুখার্জি আর শবর দত্ত। মলয় মুখার্জি মানে অনির মলয়দা প্রায় চারদশক ধরে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সম্পাদনাও করেন তিনি। আর শবর দত্ত একসময় সাংবাদিকতা করতেন, এখন সাহিত্যচর্চা করেন। মলয়দা বলেন, চল অনি একটু চা খাই। চিনি ছাড়া চা পাওয়া যাবে তো? অনি উত্তর দেয়, চলো দেখি। নিশ্চয় পাব।

স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকে ওরা। অনিরা সবাই সিনিয়র সিটিজেন। বয়স সবারই ৬০ এর ওপর। সুগারের সমস্যা অন্যদের থাকলেও অনির নেই। তবুও সে গত প্রায় কুড়ি বছর চিনি ছাড়া চা খায়। এর পিছনে একটা গল্পও আছে। অত্যধিক চা খাওয়া ও ধূমপানের কারণে অনির একসময় দাঁতের সমস্যা দেখা দেয়। তখন এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখাতো। দাঁতের সমস্যায় ভুগতে থাকায় ওই ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি বলেন, 'তুমি তো দিনে অনেকবার চা খাও। চায়ে চিনি খেও না। তাতে দাঁত ভালো থাকবে।' সেই থেকে চিনি ছাড়া চায়ে অভ্যস্ত হয়েছে অনি। স্টেশনের কাছে রামুর চায়ের দোকানে পৌঁছোয় ওরা। তিনটে চিনি ছাড়া চায়ের অর্ডার দেয় শবরদা। বেঞ্চে বসে মলয়দা ও শবরদা নানান কথাবার্তা বলতে থাকে। এদিকে অনি তার সাংবাদিকতা জীবনের বিভিন্ন সময়ে ঢুকে পড়ে। চিন্তার ডালপালা ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে অতীতে।

—চা নিন অনিদা। শবরদার ডাকে সাড়া দিয়ে চা হাতে নেয় অনি। চুমুক দেয়। মলয়দা ও শবরদার কথাবার্তার মধ্যে মাঝেমধ্যে ঢুকে পড়লেও স্মৃতি পথে চলতে থাকে সে।

কত ধরনের সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেছে! দৈনিক, সান্ধ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংবাদপত্র থেকে ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম অর্থাৎ ওয়েব নিউজ মিডিয়াতেও কাজ করেছে। যদিও সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশুনো করেনি। বাংলা ভাষায় তেমন জ্ঞান অর্জনও করতে পারেনি। সাধারণ ভাবে বিএ পাশ। অথচ, ছোটোবেলা থেকে সাংবাদিকতা পেশার প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাকে টেনে এনেছে এই জগতে। আর যত এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে ততই যেমন অবাক হয়েছে, তেমনই হতাশ হয়েছে। তবুও অদ্ভুত এক নেশায় সাংবাদিকতাকে আঁকড়ে আজও বেঁচে আছে বা বলা ভালো টিকে আছে। জীবনের কোনও কোনও সময়ে বুদবুদের মতো স্বচ্ছলতা দেখা দিলেও তা স্থায়ী হয়নি। গত ১৬ বছরে কমপক্ষে ১৫-১৬টি সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেছে অনি। কোথাও সাব-এডিটর, কোথাও ডিস্ট্রিক্ট পেজ ইনচার্জ, কোথাও ন্যাশনাল-ইন্টারন্যাশনাল নিউজ ডেস্কে সিনিয়র সাব-এডিটর, আবার কোথাও নিউজ এডিটর হিসেবে কাজ করেছে। দীর্ঘ এই কর্মজীবনে কোনও সংবাদ মাধ্যম থেকে কোনও নিয়োগপত্র কখনও পায়নি। অফার লেটার বা জয়েনিং লেটার নিয়েই কাজে যোগ দিতে হয়েছে। বড়োজোর মিলেছে প্রেস আইডেন্টিটি কার্ড। পরিহাসের বিষয়, অনির মতো অগণিত সাংবাদিক চাকরি জীবনে কোনও নিরাপত্তা কোনও দিন পায়নি বা এখনও পায় না। অথচ সাংবাদিকরাই দেশের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত পেশার নিরাপত্তা, যাবতীয় অনিয়ম, বেআইনি কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি, মানুষের অধিকার, গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে নিয়মিত কাজ করেন। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে যাপন করেও সাধারণ মানুষের বঞ্চনার বিরুদ্ধে কলম ধরেন তাঁরা। সরকার এনিয়ে কোনও পদক্ষেপ কখনও করে না। শাসকদল বা বিরোধী শক্তি তাদের বিপক্ষে খবর হলে সাংবাদিক বা সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমকে তুলোধোনা করে, সাংবাদিকের ওপর আক্রমণ নেমে আসে। এসব স্বাভাবিক হলেও সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা উপেক্ষিতই থেকে যায়। তাই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মী, আধিকারিক বা অধিকর্তাদের পক্ষেও বৃহৎ সংবাদ মাধ্যম সংস্থার সাংবাদিকরা ছাড়া অন্যান্য যে বিপুলসংখ্যক সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন, তাদের বোঝা কখনওই সম্ভব নয়। ফলে পেনশন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিলেও পেনশন পাবে, এমন আশা করতে পারছে না অনি।

—কি ভাবছিস অনি? মলয়দার প্রশ্নের জবাবে জানায়, তেমন কিছুই না। ভাবছি, আয় নেই অথচ এই অ্যাপ্লিকেশন করতে শ'তিনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। আমার মনে হয় হবে না, তবুও সবার কথায় করতে হলো!

—ভাবিস না, যা হয় হবে। চেষ্টা তো করতে হবে। যাক, আমি চলি। আমার আবার প্রেসে যেতে হবে। এই সংখ্যাটা ছাপতে দেরি হয়ে গেল...।

আশ্বিন মাস। দিকে দিকে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি চলছে। যদিও বর্ষা

বিদায় নেয়নি। গুমোট গরম। ছোটোবেলায় এসময়ে হালকা ঠান্ডার যে আমেজ পাওয়া যেত তা গত বেশ কয়েকবছর ধরে উধাও। বাংলায় ঋতু পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত আগে আকাশ-বাতাসে পাওয়া যেত, তা আর দেখা যায় না। একমাত্র বাড়িতে বাগান থেকে শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে এলে বোঝা যায় শরৎ এসেছে। চায়ের দোকানে বসে এসব হাবিজাবি ভাবনার সুর কেটে যায় শবরদার কথায়। এতক্ষণ শবরদা তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ উলটে পালটে দেখছিল। —নিন ধরুন। সদ্য প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ অনির হাতে তুলে দিয়ে শবরদা বলেন, 'নতুন উপন্যাস, পড়বেন। কেমন লাগলো জানাবেন। আমায় যেতে হবে। ডিউটির সময় হয়ে গেছে।' চলে গেলেন শবরদা। শবরদা দীর্ঘদিন সংবাদ ও সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন থাকলেও পেটের দায়ে একটি গুদামে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করেন। সত্তর বছরের বেশি বয়স তাঁর। ১২ ঘণ্টা ডিউটি করেন। পাঁচটা বেজে গিয়েছে। ৬টায় ওকে কাজে যোগ দিতে হবে। সকাল ৬টা পর্যন্ত ডিউটি। তারপর সারাদিন এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানো আর সুযোগ মতো লেখার চেষ্টা, এনিয়েই দিব্যি বেঁচে আছেন। ফেলুদার গল্পের জটায়ুর মতো চেহারার এই মানুষটিকে নিয়ে বহু কথা আছে। কিন্তু এখন নিজের অতীত, নিজের ব্যর্থতাকে ফের একবার দেখার চেষ্টা করতে চায় অনি। একটা চিনি ছাড়া চায়ের অর্ডার দিয়ে ফের ভাবনায় ডুবে যায় অনি।

প্রায় বছর পঁচিশ আগে একটি ট্যাবলয়েড সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল অনি। সেই মতন রেজিস্ট্রেশন করে প্রকাশনা শুরুও করে। কিন্তু মাসতিনেক প্রকাশের পর অনিবার্য কিছু কারণে তা অনিয়মিত হয়ে যায়। এরপর পাক্ষিক সংবাদপত্র হিসাবে অনিয়মিত ভাবে প্রকাশের চেষ্টা করতে থাকে সে। সেই সঙ্গে পেটের তাগিদে জেলার অন্যান্য আঞ্চলিক সংবাদপত্রে খবর, পোস্ট এডিট লেখার কাজও চালিয়ে যেতে থাকে। এছাড়াও স্থায়ী কাজের জন্য বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে বায়োডাটা পাঠানো শুরু করে। চেষ্টা করতে করতে জুটেও যায় কাজ। এ রাজ্যে নয়, অসমের একটি বাংলা দৈনিকে। গুয়াহাটি শহরে অফিস। সাব-এডিটর পদে যোগ দেয় অনি। বছরখানেক সেখানে কাজ করে। প্রথম কয়েকমাস ন্যাশনাল/ইন্টারন্যাশনাল পেজে কাজ করার পর ম্যানেজমেন্ট তাকে নর্থ-ইস্ট পেজের দায়িত্ব দেয়। বেশ ছিল সেখানে। কলকাতা থেকে যাওয়া বেশ কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মেসবাড়িতে দিনযাপনে আলাদা মজা ছিল। কিন্তু বাড়ি, নিজের পাড়া ছেড়ে থাকতে বেশ কষ্টও হতো। আর চিন্তা হতো স্ত্রী তৃণার জন্য। ও তখন বাড়িতে একা থাকে। তাই কলকাতা বা কলকাতার কাছে কোনও সংবাদ মাধ্যমে কাজের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে অনি। নতুন এক যোগাযোগও হয়ে যায় তাঁর। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের মালদা এডিশনে সাব-এডিটর নিয়োগ হবে খবর পায়। ইমেলে আবেদন করে। এর প্রেক্ষিতে তাঁর মেলে ওই সংবাদপত্র দফতর থেকে পরীক্ষায় বসার জন্য ডাকা হয়। সেই পরীক্ষা হবে ওদের কলকাতা অফিসে। দিন পাঁচেকের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরে অনি। নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষাও দেয়। এরমধ্যেই এক সাংবাদিক দাদা ও এক সহকর্মীর সুপারিশে কলকাতার এক প্রাচীন ইংরেজি সংবাদপত্র গোষ্ঠীর বাংলা দৈনিকে কাজের সুযোগ আসে। যোগ দেয় সেখানে।

সুপরিচিত ওই দৈনিক সংবাদপত্রে যোগ দেওয়ার পর অনির জীবনে ফের বিপর্যয় নেমে আসে। ডেস্ক জার্নালিস্ট হিসাবে তাঁর প্রথম চাকরি অসমের যে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে, তারা তাঁকে যে নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা দিয়েছিল, যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যে দিয়েছিল, তা কয়েকমাসের মধ্যেই হারিয়ে যায়। কারণ, অসমে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে বেতন হলেও কলকাতায় দু'মাস দশদিন পর একমাসের বেতন দেওয়াটাই রীতি দেখা যায়। কখনও সখনও তিনমাস পর একমাসের বেতন পাওয়া যেত। মনে আছে, তখন স্টেশন রোডের একটি মুদি দোকানে মাসকাবারি খাতা ছিল। সময়মতো বকেয়া পরিশোধ না করার কারণ হিসাবে বেতন হচ্ছে না জানালে মুদি-দোকানি বলেছিল, 'বালের কথা বলেন! এত নামকরা কাগজ স্যালারি দিচ্ছে না?

—চা নাও অনিদা। রামুর ছেলে সৌগতর ডাকে সেদিকে তাকায় অনি। বেঞ্চ ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে চা নেয়। জেলা শহরের রেলস্টেশনের কাছে এই চায়ের দোকানে অনিদের মফস্বল এলাকার মতো টেবিল নেই। চা-দোকানি নিজের জায়গা ছেড়ে এসে হাতে চা তুলে দেয় না। চা খেয়ে একটা বিড়ি ধরায় অনি। দাম মিটিয়ে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে। আপ বনগাঁ লোকাল ধরে হাবড়া যায়। ওখানে একজনের সঙ্গে দেখা করে কাজ মিটিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য স্টেশনে আসে। মনটা চা চা করলেও উপায় নেই। হাবড়া স্টেশন ফাঁকা, দোকানপাট উধাও। রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর মাত্র কয়েকদিনের নোটিশে হকার উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে রেল। বুলডোজার চালিয়ে স্টেশন এলাকা ও প্লাটফর্মের দোকানপাট ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ১নং প্লাটফর্মে অসীমের চায়ের দোকানের সেই মুখে লেগে থাকা চিনি ছাড়া চা আর পাওয়া যাবে না। সেই মিষ্টি হেসে 'দাদা চা নাও' বলা অসীম এখন কি করছে কে জানে! ডাউন ট্রেন ধরবে অনি। ৩নং প্লাটফর্মে আসে। সময় সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। প্রচুর ঝলমলে আলো থাকলেও কেমন প্রাণহীন এই স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় পায়চারি করতে থাকে অনি। কানে আসে, '—কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, না রে।

—সত্যিই হঠাৎই কেমন যেন সব বদলে গেল। খারাপ হচ্ছে না ভালো জানিনা, তবে খুব, খুব খারাপ লাগছে।

—এমনটা দেখতে তো অভ্যস্ত নই আমরা। ছোটবেলা থেকে যেমন দেখেছি সেই ছবি কোথায় হারিয়ে গেল।

—এই মানুষগুলোর কি হবে, কে জানে!'

দুই তরুণীর কথাবার্তায় তাদের লক্ষ্য করল অনি। দুজনেরই বছর বিশেক বয়স হবে। পোশাক পরিচ্ছদ ও চেহারায় নিম্নবিত্ত স্বচ্ছল পরিবারের ছাপ রয়েছে। লোকজন, হৈচৈ, নিত্যযাত্রীদের ভিড়, কর্মব্যস্ত প্রাণচঞ্চল সদ্য অতীত এই স্টেশন এখন প্রাণহীন, ধ্বংসস্তূপ। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিকা হারানো কিছু মানুষের প্রয়োজনীয় কিছু হাতড়ে বেড়ানোর ছবি ভাসছে। আর তা নিয়ে একটু হলেও ভাবছে এই প্রজন্ম, এটা দেখে অনির বেশ ভালো লাগলো। যদিও 'জবরদখল'

উচ্ছেদের নামে হাজার হাজার মানুষের তিল তিল করে গড়ে তোলা জীবিকার ক্ষেত্র সহজে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ায় খুশি হয়েছে সমাজের সুবিধাভোগী একশ্রেণির মানুষ। উন্নয়নের খোয়াব দেখছে তারা।

ডাউন বনগাঁ লোকালের খবর হয়েছে। প্লাটফর্মে প্রচুর মানুষের ভিড়। নিত্যযাত্রী ছাড়াও পুজোর বাজার করে ফিরছে এমন বহু মানুষ রয়েছে। ট্রেনে উঠে ভিড়ের মধ্যেই কোনও রকমে দাঁড়িয়েছে অনি। এক বাদাম বিক্রেতা হকার 'বাদাম চাই বাদাম' করতে করতে 'একটু সাইড দিন কাকু' বলে অনিকে হালকা চাপ দিয়ে নিজের পথ করে ভিতরে চলে যায়। পাশে দাঁড়ানো এক যুবক অনিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, ট্রেনে হকারি বন্ধ করে দিয়েছে রেল। ফাইন করা শুরু করেছে। ভালোই হবে বলুন? যাতায়াতে কোনও কষ্ট থাকবে না। কোনও উত্তর দেয় না অনি। ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। একই দিনে অল্প সময়ের ব্যবধানে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। মানবিকতা কি তবে হারিয়ে যাচ্ছে? এ প্রশ্নে নিজের মনেই বিড়বিড় করে ওঠে। সমাজের সুবিধাভোগী একটা বিশেষ অংশ নিজেদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই ব্যস্ত। অন্য কাউকে নিয়ে ভাবার সময় নেই এদের। জীবিকা হারিয়ে বিপর্যস্ত হকারদের উদ্দেশ্যে এই অংশের বহু মানুষ নির্দ্বিধায় বলেন, 'রেলের জায়গা দখল করে ব্যবসা করেছে। অনেক টাকা করেছে।' 'জানেন এই হকারদের অনেকেরই দোতালা বাড়ি।' এছাড়া, 'প্লাটফর্মের জায়গা দখল করে দোকান করেছে, অথচ দ্যাখো, দোকানের সামনে দাঁড়ালেই সরে দাঁড়ান, সরে দাঁড়ান বলে খিঁচিয়ে ওঠে। সে দিন তো শেষ। দ্যাখ, কেমন লাগে', 'এদের কোনও অসুবিধা হবে না, অন্য জায়গায় দোকান আছে' গোছের মন্তব্যও করেন তাঁরা। একবারের জন্যও ভাবে না যে, রাজ্যের বিভিন্ন রেলস্টেশন প্লাটফর্ম বা ফুটপাত দখল করে যে হাজার হাজার মানুষ ছোটোখাটো ব্যবসা করে সংসার চালান, তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সরকারের। সরকার সে দায়িত্ব পালন করে না বলেই সাধারণ মানুষকে বাধ্য হয়েই জীবিকার জন্য এমন পথ বেছে নিতে হয়। এসব ব্যবসায়ীরা জানতেন যে, সরকার যেকোনও সময় তাঁদের তুলে দিতে পারে। ভাড়ার বিনিময়েও সেখানে ব্যবসা করতে অনেকেই রাজি ছিলেন। সরকার এতে গুরুত্ব দেয়নি। নিজেরাই সরে যাওয়ার জন্য হকারদের অনেকেই আরও একটু সময় চেয়েছিলেন, সেটাও তাদের দেয়নি সরকার। তাছাড়া, দীর্ঘদিন ব্যবসা করে কিছুসংখ্যক হকার বাড়ি, গাড়ি বা সঞ্চয় করলেও বেশিরভাগই যে কোনও রকমে সংসার চালান, তা আমাদের সমাজের চারপাশ দেখলেই বোঝা যায়। আসলে সুবিধাভোগী ওই অংশের মানবিকতা বলে আর কিছু নেই। বামনগাছি স্টেশনের চা-বিক্রেতা বাবুদা, বিড়ার তপন, হাবড়ার অসীম বা অশোকনগরের নির্মলদার অসহায় মুখ-চোখ দেখলে খুব খারাপ লাগে অনির। নিজেকে আরও বেশি অসহায় মনে হয়। ট্রেন ঢুকেছে অশোকনগরে। নেমে যায় অনি। বাড়ির পথে হাটতে শুরু করে।

কলকাতার সেই প্রাচীন সংবাদপত্র গোষ্ঠীর বাংলা দৈনিকে বেশিদিন কাজ করতে পারেনি অনি। সংসারে তীব্র অভাব, তৃণার সঙ্গে মাঝেমধ্যে অশান্তি, দেনার চাপ সব মিলিয়ে বিপর্যস্ত জীবনে দুর্গাপুজোর সময় বেতন না পেয়ে কাজ ছেড়ে দেয় সে। এরপর দৈনিক, সান্ধ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, মাসিক ম্যাগাজিন-সহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করেছে। তবে বেশিদিন কোথাও থাকেনি। কারণ, নিয়মিত বেতন না হওয়ায় বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আর পরিশ্রমের মূল্য বহু টাকা ওইসব সংবাদ মাধ্যম অবলীলায় মেরে দিয়েছে। সাংবাদিকদের প্রতি এই বঞ্চনা, অনিয়ম নিয়ে কখনও সাংবাদিকদের কোনও অ্যাসোসিয়েশন, প্রেস ক্লাব, সরকার বা বিরোধী রাজনৈতিক শিবির কাউকেই সোচ্চার দেখেনি অনি। পরিবারের লোকজন ও পরিচিত স্বজন বান্ধব অধিকাংশই সংবাদ মাধ্যম জগতের এই হাল জানে না। ফলে বিভিন্ন সময়ে তাঁরা রীতিমতো খোঁচা দিয়ে বলেছে, অনির হাড়ি কালো হয় না। কোথাও একভাবে কাজ করতে পারে না। কেউ কেউ জ্ঞান দিয়ে বলেছে, 'একটু সহনশীল হয়ে কাজ কর। থিতু হ।' সবই নীরবে হজম করেছে। কেননা অনি জানে, সে কড়িকাঠে গলা আটকে থাকা পাঁঠা। বলি না হওয়া পর্যন্ত কষ্ট তো পেতে হবেই! কর্মজীবনের শুরুতে অসমের ওই দৈনিক কাগজে ঠিকঠাক বেতন পেয়েছিল। এরপর দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনযাপন। আর শেষ চাকরি যে দৈনিক সংবাদপত্রে, সেখানে মিলেছে নিয়মিত বেতন। যদিও তাতে খুব একটা এগোয়নি। স্বল্পসংখ্যক কর্মী থাকায় সেখানে মারাত্মক চাপের মধ্যে কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে অনি। অনিশ্চিত জীবনযাপনে এর আগে একবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয় তাঁর। আর এবার দেখা দেয় প্রস্টেট-এর সমস্যা। করোনা অতিমারির শেষদিকে কর্মী সংকোচন প্রক্রিয়া শুরু করে ম্যানেজমেন্ট। প্রস্টেটের সমস্যায় দিনসাতেক অফিস কামাই হওয়ার পর একদিন নিউজ এডিটর ফোন করে অনির শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। এরপর তিনি জানান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর কথা বলতে চান। বিষয়টি বুঝে যায় অনি। সে ফোন করে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে জানায় যে, অসুস্থতার কারণে আর কাজে যোগ দিতে পারবে না। অনিকে তিনি পালটা জানান, অনির বকেয়া বেতন পাঠিয়ে দেবেন। কথা রেখেছিলেন তিনি। প্রাচীন সংবাদ মাধ্যম গোষ্ঠীর বাংলা দৈনিক, পীরজাদার বদান্যতায় প্রকাশিত দৈনিক কাগজ বা শীর্ষ এক রাজনৈতিক নেতার বদান্যতায় প্রকাশিত ট্যাবলয়েড দৈনিক কাগজের মতো পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করেননি।

এখন নিজের পত্রিকা মাসে অন্তত একবার প্রকাশের চেষ্টা করছে অনি। বছর পাঁচেক আগে পত্রিকার একটা ওয়েব এডিশন করেছে। একসময়ের সহকর্মী লাল মহম্মদ সেটা করে দিয়েছে। ফলে অনলাইনে খবর প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া গত কয়েকবছর ধরে প্রতিবছর পুজো সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এটা সম্ভব হয় দু-একজন সহকর্মীর সহযোগিতায়। তারা বেশ কিছু বিজ্ঞাপন এনে দেয়। এছাড়া তাঁর পুজো সংখ্যার বেশ কিছু কপি পুজোর সময় বিক্রিও হয়ে যায়। ফলে পুজোর সময়ে সংসার খরচের বেশ কিছুটা উঠে যায়। সেই সঙ্গে একবছর আগে থেকে বই প্রকাশ ও প্রুফ দেখার কাজও করছে। এসব করে কোনও রকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনির সংসার তাঁর স্ত্রী তৃণাকে নিয়ে। ওদের দুজনেরই বয়স ৬০ হয়েছে।

সন্তান নেই। বার্ধক্যে পৌঁছে অসহায়তা আরও বাড়ছে। শেষ বয়সে কি হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে দুজনেরই। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণা লক্ষ্মীর ভান্ডার পেত। এই প্রকল্প চালুর সময় থেকে পেয়ে আসলেও বয়স ৬০ হয়ে যাওয়ায় তা বন্ধ হয়ে গেছে। সাধারণভাবে তা বার্ধক্য ভাতায় কনভার্ট হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। পুরসভায় যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা জানান, ভোটের পর খোঁজ নিন। ভোটের পর যোগাযোগ করলে তারা বলেন, সব পোর্টাল বন্ধ। কয়েকদিন পর খোঁজ নিন। এরপর খোঁজ করলে জানান, নতুন করে বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করতে হবে। আর তা যখন শিবির হবে, তখনই করা যাবে। তৃণার সঙ্গে অনিও তাঁর নিজের জন্য বার্ধক্য ভাতার আবেদন করবে ভেবে রাখে।

এরমধ্যে রাজ্যের নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জন্য পেনশন প্রকল্পের ঘোষণা করেন। তিনি জানান, ৬০ বছর হয়ে যাওয়া অ্যাক্রিডিটেড জার্নালিস্ট অর্থাৎ সরকার স্বীকৃত সাংবাদিক এবং নন-অ্যাক্রিডিটেড জার্নালিস্টদের তাঁর সরকার মাসে ৫০০০ টাকা পেনশন দেবেন। এই প্রকল্পে আবেদনের জন্য এরপর বিজ্ঞপ্তিও জারি করে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। মুখ্যমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পর অনির একাধিক হিতাকাঙ্ক্ষী এই প্রকল্পে আবেদনের জন্য তাকে অনুরোধ জানায়। বিশেষ করে জেলা সদর বারাসাতের এক সহকর্মী সুমিত ফোন করে বলেন, 'অনিদা তুমি অবশ্যই পেনশন প্রকল্পে আবেদন কোরো। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে সমর আছে। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে নিও। আমি ফোন করে দেব।' তারপর বৃদ্ধ ভাতার জন্য আবেদন না করে সাংবাদিক পেনশনের ফর্ম নিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের কর্মী সমরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ফর্মের নির্দেশিকা অনুযায়ী গত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যুক্ত থাকার নথিপত্র খুঁজে বের করতে বেশ কয়েকদিন লেগে যায়। বিপত্তি দেখা দেয় ইনকাম সার্টিফিকেট পাওয়া নিয়ে। 'এ' ক্যাটাগরি সরকারি আধিকারিকের থেকে তা নিতে হবে বলে ওই ফর্মের নির্দেশিকায় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সহকর্মী অমিতের সুপারিশে বিডিও-র থেকে ইনকাম সার্টিফিকেট পাওয়া সম্ভব হয়।

অবশেষে সেই ফর্ম জমা করল অনি। তাঁর ধারণা, রাজ্য সরকারের এই পেনশন পাবে না সে। তবুও চারপাশের মানুষজনের কথায় আবেদন করেছে। ভেবে রেখেছে যে, এই পেনশন তাঁর মতো সাংবাদিক পেলে তা নিয়ে খবর করবে। আবার না পেলেও খবর করবে। একসময় আঞ্চলিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছে অনি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তোলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিকবার জেলা প্রশাসন থেকে রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও তথ্য সংস্কৃতিমন্ত্রীকে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে পেনশনও ছিল। কিন্তু কাজের কাজ তেমন হয়নি। বাম জমানার মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জন্য মাসে মাত্র ১৫০০ টাকা পেনশন চালু করেন। সরকার স্বীকৃত সাংবাদিকদের জন্য ওই পেনশন প্রকল্প চালু হয়। তৃণমূল ক্ষমতায় আশার পর মুখ্যমন্ত্রী সেই ১৫০০ টাকার দ্বিগুণ ৩০০০ টাকা করেন। রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, সাংবাদিকদের মাসে ৫০০০ টাকা পেনশন দেওয়া হবে। সরকার স্বীকৃত সাংবাদিকদের পাশাপাশি অন্যান্য সাংবাদিকরাও এই সুবিধা পাবেন। কিন্তু এনিয়ে সংশয় রয়েছে অনির। কারণ, এদেশে সুপারিশ ছাড়া কোনও সুবিধা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। আর সে ওই ধরাধরির মধ্যে কখনও যায়নি, যেতেও পারবে না। এসব চিন্তার থেকেও শরীর নিয়ে অনির দুশ্চিন্তা বাড়ছে ক্রমশ। হার্ট দূর্বল হয়েছে। একবার সিগনালও দিয়েছে। জীবনভর ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। খাচ্ছেও। এরপর প্রস্টেটের সমস্যায় ওষুধ নিয়মিত সঙ্গী হয়েছে। এখন দেখা দিয়েছে পেটের রোগ। ক'দিন আগে হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরলেও পেট এখনও ভোগাচ্ছে। ডাক্তার, ওষুধ, খাদ্যখাবারে বিধিনিষেধের পরও মুক্তি নেই। মনের জোরও কমছে। সংবাদ জগত অনিকে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা দিয়েছে। সঞ্চয় বলতে কিছুই নেই। বেতন কোনও দিন নিয়মিত ছিল না তো সঞ্চয়! যাক, তৃণা ভাণ্ডারের টাকা কিছুটা জমাতে পেরেছে। আর কিছুটা বাড়িঘর মেরামতে ব্যবহার করা হয়েছে। অনির কিছুই নেই। কলম নির্ভর জীবন। এর বাইরে কিছুই করতে পারে না। কয়েকবার অন্য ভাবে উপার্জনের চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। এখন শেষ জীবন কিভাবে কাটবে সেই চিন্তাই অস্থির করে তুলেছে তৃণাকে। অনির যে সেই চিন্তা নেই তা নয়, কিন্তু সে তা প্রকাশ করে না। তাঁর দুশ্চিন্তা প্রকাশের কোনও জায়গাও নেই।

দু'দিন আগে সরকারের তরফে আয়োজিত শিবিরের খবর পেয়ে তৃণাকে নিয়ে সেখানে যায় অনি। তৃণার জন্য বার্ধক্য ভাতার একটি আবেদনপত্র নিয়ে তা পূরণ করে। নাম, ঠিকানা বা অন্যান্য তথ্য দেওয়ার পর মোট পারিবারিক আয় কলামে ৯৫০০ টাকা লেখে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মী বলেন, 'এত আয় লিখলে বার্ধক্য ভাতা পাওয়া যাবে না। এক থেকে দু'হাজার টাকা লিখুন।' অনি প্রশ্ন করে, পারিবারিক মাসিক আয় মাত্র ২০০০ টাকা হলে খুব ছোটো একটা পরিবারও কি বেঁচে থাকতে পারে? গ্যাস আর ইলেকট্রিকেই তো ১৫০০ চলে যাবে! এরপর জল আছে। জলও এখন কিনে খেতে হয়। তবে কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকে এই আয়ের মানুষ? এটা মিথ্যা কথা হয়ে যায় না? ওই কর্মী বলেন, 'অত কথার জবাব দিতে পারব না। আপনার যা মনে হয় করুন।' এরপর ওই কর্মী ও তাঁর সহকর্মীরা হাসাহাসি করে। বলে, মাসে প্রায় ১০০০০ আয়, বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করছে! অনি বেশ দ্বিধায় পড়ে যায়। এদিকে তৃণা ক্রমাগত বলতে থাকে, ওটা কেটে ১৫০০ করে দাও। ওরা যেমন বলছে করো। তৃণাকে নিয়ে শিবিরের বাইরে আসে। একটা জায়গায় বসে আবেদনপত্রটি আবার খুটিয়ে দেখে। লক্ষ্য করে, আবেদনপত্রের পিছনে একটি সম্মতিপত্র চাওয়া হয়েছে। ওটা অবিকল এইরকম— শিরোনাম 'আধার প্রমাণীকরণের জন্য সম্মতিপত্র'। এরপর রয়েছে—আমি, আধার নম্বর...এর ধারক নারী ও শিশু বিকাশ এবং

সমাজ কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কে UIDAI-এর সাথে প্রমাণীকরণের জন্য আমার আধার নম্বর, নাম এবং আঙুলের ছাপ (ফিঙ্গারপ্রিন্ট)/আইরিস ব্যবহার করার সম্মতি দিচ্ছি। নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে বলেছেন যে শুধুমাত্র 'বার্ধক্য ভাতা' ডাটাবেস প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যেই আমার পরিচয় ব্যবহার করা হবে এবং আরও বলেছেন যে আমার বায়োমেট্রিক সংরক্ষণ করা হবে না/কাউকে দেওয়া হবে না, এবং শুধুমাত্র প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে CIDR-এ জমা দেওয়া হবে।
আধার নম্বর ধারকের স্বাক্ষর/ আমার সম্মতি আছে। আবেদনকারীর নাম.....।

বিষয়টা তৃণাকে বুঝিয়ে বলে অনি। তখন তৃণা বলে, 'তুমি যা ভালো বোঝো করো।' এরপর আবেদনপত্র জমা দিয়ে বেরিয়ে আসে। কেবলমাত্র সাদা কাগজে তৃণার আয় নিয়ে যে 'সেল্ফ ডিক্লারেশন' আবেদনপত্রের সঙ্গে দেয়, তাতে ওর ব্যক্তিগত আয় ১৫০০ টাকা উল্লেখ করে অনি। যদিও তাঁর মনে হয় যে, তৃণা বার্ধক্য ভাতা পাবে না।

সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে নানান প্রশ্ন দিনভর অনির মনে ঘুরপাক খায়। বার্ধক্য ভাতার আবেদনপত্রে সবাইকেই পারিবারিক আয় ২০০০ টাকার মধ্যে লিখতে একপ্রকার বাধ্য করা হচ্ছে। আবার তথ্য যাচাইয়ের জন্য আধার ব্যবহারের সম্মতিও নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পেনশনভোগী সরকারি বা বেসরকারি কর্মী ছাড়া বার্ধক্য ভাতা তো ৬০ ঊর্ধ্ব সকলেরই পাওয়া উচিত। যদিও এই ভাতায় একজন মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। আয়ের অন্য কোনও সূত্র থাকতেই হবে। কেননা জলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদও এখন পণ্য। বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। সরকারি ব্যবস্থাই জলকে পণ্য করেছে। সেসব আলোচনা দূরে রেখে অনির মনে প্রশ্ন জাগে, দারিদ্রসীমার নীচে থাকা অসহায় বৃদ্ধ নাগরিকদের কিছুটা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে চালু হওয়া বার্ধক্য ভাতার মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এখনও কেন বৃদ্ধি পেল না। প্রায় ২৫ বছর আগে চালু এই প্রকল্পে মাসে মাত্র ২০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ এখনও কেন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে? বাজারদর বাড়ছে প্রতি মূহুর্তে, বাড়ছে মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়কদের বেতন। একবার একটি দৈনিক কাগজে পোস্ট এডিট লিখেছিল অনি। সম্ভবত ২০১৮ সালে। শিরোনাম ছিল 'বিপন্ন প্রবীণদের সবার জন্যই পেনশন চালুর দাবি উঠুক'। তখন যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তাতে দেশে ১০ কোটি প্রবীণ মানুষের মধ্যে মাত্র আড়াই কোটি প্রবীণ সরকারি এই প্রকল্প অর্থাৎ বার্ধক্য ভাতার সুযোগ পান। বলা যায়, মোট সংখ্যার চারভাগের তিনভাগই বঞ্চিত। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে পেনশন পরিষদ নামে একটি সংগঠন দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রায় ১০ হাজার বৃদ্ধকে জড়ো করে দাবি করেছিল যে, দারিদ্রসীমার নীচে বা উপরে বলে কিছু নয়, সব প্রবীণদের জন্যই পেনশন (বার্ধক্য ভাতা) চালু করতে হবে। মাসে কমপক্ষে ৩০০০ টাকা দিতে হবে। এই বরাদ্দকে বাজার দরের সঙ্গে যুক্ত করে এর বৃদ্ধি করতে হবে। যদিও তাদের এই সঙ্গত দাবি নিয়ে উদাসীন থাকে সরকার ও বিরোধী সব রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলগুলোর এজেন্ডাতেও প্রবীণদের সুরক্ষার প্রশ্ন উপেক্ষিত। অথচ, প্রবীণ নাগরিকদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না সরকার। অস্বীকার করতে পারে না কোনও রাজনৈতিক দল। অথচ সরকার, পরিবার, সমাজ সবক্ষেত্রেই উপেক্ষিত থাকছে প্রবীণরা। উপেক্ষা যেখানে সরকারি নীতি, ভোটের রাজনীতি, ভোটার দেখে সুবিধা দেওয়ার রাজনীতিতে প্রকৃত উপভোক্তা বঞ্চিত হওয়াটা যে দেশে রীতি, সেখানে অনির মতো মানুষ বা তাঁর পরিবার বার্ধক্য ভাতা পাবে এর নিশ্চয়তা নিয়ে সংশয় তো থাকেই, আর সেই সংশয়তাকে নিয়ে হেঁটে চলে অনি!



শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন...

সকলে ভালো থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন...

গীতা ঘোষ

অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

রাজনীতি

আশিস কুমার ঘোষ

ব্যবসা করতে গেলে পুঁজি লাগে, অভিজ্ঞতা লাগে, পরিশ্রম লাগে, ঝুঁকি নিতে হয়। লাভ হবে কি না, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এত ঝামেলার মধ্যে আজকাল নতুন এক ব্যবসার কথা শুনছি; রাজনীতির ব্যবসা। ভাবলাম, এই ব্যবসাটাই বোধহয় আমার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এই ব্যবসার সবচেয়ে বড় সুবিধা;এখানে বয়সের বিশেষ বালাই নেই, শিক্ষাগত যোগ্যতারও তেমন কড়াকড়ি নেই। পড়াশোনা একদম না জানলেও চলবে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিদিন দোকান খুলে বসতে হয় না, সকাল থেকে সন্ধ্যা খাটতে হয় না। শুধু একটা নির্বাচনে দাঁড়াতে হয়, কিছু টাকা খরচ করতে হয়, আর জনগণের সামনে নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হয় যেন তাঁদের জন্য আমার জন্ম, তাঁদের জন্যই আমার জীবন!

ভোটের সময় অবশ্য ব্যাপারটা একটু পরিশ্রমের। তখন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। দরজায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলতে হবে, 'আমি আপনাদের ঘরের ছেলে। আপনাদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকব।'

ভোটারও তখন আমার আপনজন। কারও শিশুকে কোলে তুলে আদর, কারও মাথায় স্নেহের হাত, বয়স্ক মানুষ দেখলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম। কারও বাড়িতে গিয়ে এমনভাবে বসতে হবে, যেন বহুদিনের আত্মীয়। প্রয়োজনে দু-একটা ফাই-ফরমাসও খেটে দিতে হবে। সবটাই অবশ্য ভোটের আগ পর্যন্ত।

তারপর আসবে প্রতিশ্রুতির পালা। রাস্তা হবে, আলো হবে, জল হবে, হাসপাতাল হবে, স্কুল হবে, কর্মসংস্থান হবে;কী হবে না! পাঁচ বছরের উন্নয়নের পরিকল্পনা পাঁচ মিনিটের বক্তৃতায় শেষ করে দিতে হবে। শ্রোতারা হাততালি দেবেন, আমিও আবেগে গলা ভারী করে বলব, 'আপনাদের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।'

তারপর যদি ভাগ্যদেবী একটু সদয় হন এবং ভোটে জিতে যাই, তাহলেই কেল্লা ফতে!

হাতে ফুলের মালা, গলায় উত্তরীয়, চারপাশে ক্যামেরা; আর নতুন পরিচয়, জননেতা মহাশয়। যে ভোটারকে কয়েকদিন আগেও 'কাকু', 'জ্যাঠু', 'দাদা' বলে ডাকতাম, তিনি তখন হঠাৎ সাধারণ নাগরিক হয়ে যাবেন। দেখা হলে চিনতে একটু অসুবিধা হওয়াটাই স্বাভাবিক। পাঁচ বছর যে অনেক বড় সময়!

আর প্রতিশ্রুতির কথাও যদি কেউ মনে করিয়ে দেন, চিন্তার কিছু নেই। রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি অনেকটা নির্বাচনী আতশবাজির মতো; ভোটের রাতে আলো ছড়ায়, তারপর আকাশে মিলিয়ে যায়।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় অবশ্য দলবদল। গতকাল যে দলকে দেশের উন্নতির একমাত্র পথ বলে প্রচার করেছি, আজ সুযোগ বুঝে সেই দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিলেও অসুবিধা নেই। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে গম্ভীর মুখে বলতে হবে, 'আমি আদর্শের টানে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' আদর্শও বড় বিচিত্র জিনিস;সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে তার ঠিকানাটাও বদলে যায়!

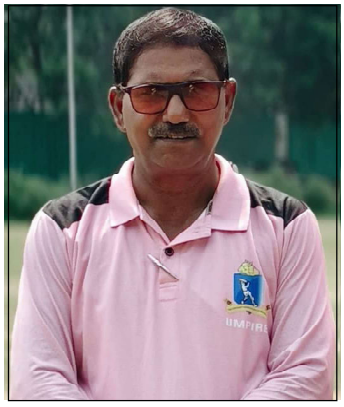
তবে এই ব্যবসায় একটা ঝুঁকি আছে। পাঁচ বছর পর আবার ভোট চাইতে গেলে সেই পুরনো ভোটারদের মুখোমুখি হতে হবে। তাঁরা যদি আগের প্রতিশ্রুতিগুলোর হিসাব চান, তখন কী বলব?

ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। বলব, 'সব কাজই হয়েছে। শুধু আপনার চোখে পড়েনি!'

তবে শেষ পর্যন্ত একটা ভয় থেকেই যাচ্ছে। এতদিন শুনেছি রাজনীতিবিদরা জনগণকে বোকা বানান। যদি কোনোদিন জনগণই বুঝে যান যে রাজনীতিকে ব্যবসা বানানো যায় না, রাজনীতি আসলে মানুষের সেবা; তাহলে আমার মতো ব্যবসায়ীদের কী হবে?

তাই আপাতত রাজনীতির ব্যবসায় নামার পরিকল্পনা স্থগিত রাখলাম। কারণ ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি বোঝা যায় হিসাবের খাতায়।

কিন্তু রাজনীতির লাভ-ক্ষতির হিসাব; সেটা বোধহয় জনগণের খাতায় লেখা থাকে।

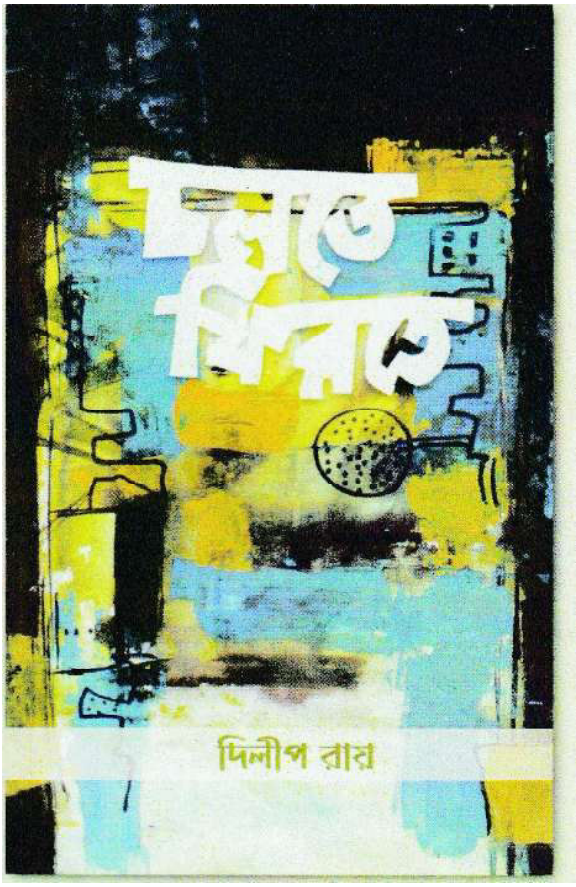


শারদীয়া শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ-

রতন চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত সিএবি আম্পায়ার এবং ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বা সংগঠক

আম্পায়ারিং: ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ টানা ৪ বছর সিএবি ট্রেইনি আম্পায়ার এবং ১৯৯৮ থেকে ২০২৫ টানা ২৭ বছর কাজ করেন রাজ্য প্যানেল আম্পায়ার হিসাবে। সিএবির বিভিন্ন বিভাগের খেলা ও বিসিসিআই-এর মহিলা ও স্কুল ক্রিকেট খেলা পরিচালনা করেছেন। এখন রঞ্জি ট্রফি ও বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য স্ট্যান্ডবাই আম্পায়ার।



দিলীপ রায়-এর ছোটো গল্পের বই

‘চলতে ফিরতে’

দৈনন্দিন জীবনের ভিড়েই জমে ওঠা
ছোট ছোট মুহূর্তের টুকরো কথা।
কখনও ট্রেনের সীটের কোণে,
কখনও চায়ের দোকানে, কখনও ক্লাবঘরে
বা অফিসের ব্যস্ত সময়ে- শব্দেরা জুড়ে
গিয়েছে গদ্যের ভুবন।
‘চলতে ফিরতে’ কেবল গল্প নয়,
আবার নিছক গদ্যও নয়-এ যেন
লেখকের চলাফেরার সঙ্গী হয়ে ওঠা
অক্ষর আর অভিজ্ঞতার
এক অনবদ্য মেলবন্ধন।
বইটির ভূমিকা লিখেছেন
বিশিষ্ট সাংবাদিক সুকুমার মিত্র।
‘চলতে ফিরতে’ সেইসব পাঠকের জন্য,
যাদের মনে হয়- শব্দেরা কেবল
লেখা নয়, জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

এই গ্রন্থ সংগ্রহে আগ্রহীরা ২০০ টাকা পাঠিয়ে
অগ্রিম বুকিং করুন।
সেই সঙ্গে পেমেন্ট-এর স্ক্রীন শট
এবং নিজের নাম, ঠিকানা ৭৬৭৯৫২০৩৫০
নাম্বারে হোয়াটস্‌অ্যাপ করুন।

Dilip Roy